তিনকন্যা

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

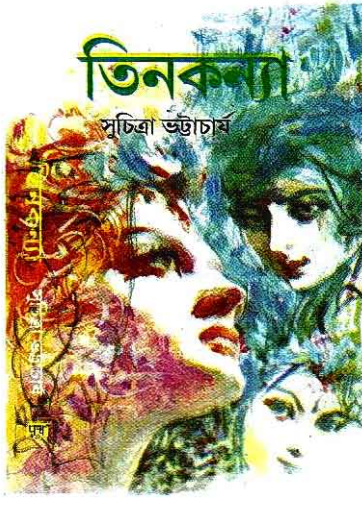

নন্দিনী অর্পিতা শ্যামলী—তিনজনের জীবন বইছে একেবারে ভিন্ন খাতে, তবু তিনজনের যেন কোথায় খুব মিল। তিনজনই ভাগ্যবিড়ম্বিত, চাকরিজীবী, তিনজনই জীবনের সঙ্গে সংগ্রাম করে চলেছে নিরন্তর। নন্দিনীর দাম্পত্যজীবনে জটিল ছায়া ফেলেছে তার মানসিক বিকারগ্রস্ত বাবা, ছেলেমেয়ে নিয়ে অর্পিতার প্রায় নিস্তরঙ্গ হয়ে আসা সংসারে ঢেউ তোলে তার দুশ্চরিত্র স্বামী, শ্যামলীর বিষণ্ণ দিনযাপনে হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো আবির্ভূত হয় তার মেয়ে।

'তিন কন্যা' এই তিন নারীর জীবন নিয়ে তিনটি কাহিনী। নন্দিনী অর্পিতা শ্যামলীর সুখদুঃখের মাঝে লুকিয়ে আছে জীবনের চিরন্তন সুর। হার না মানার লড়াই। বেঁচে থাকার অপার তৃষ্ণা। সুচিত্রা ভট্টাচার্যর মরমী কলমে এই তিন নায়িকা ভীষণ ভাবে জীবন্ত, বড় বেশি চেনা চেনা, পথেঘাটে ট্রামেবাসে যেন অহরহ এদের দেখা মেলে।

নন্দিনী অর্পিতা শ্যামলী—এ যুগের তিন কন্যা।

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

তিন কন্যা

banglabooks.in

পুষ্প
তের ব্লক "বি" বাঙুর এভিন্যু কলকাতা সাত লক্ষ পঞ্চান্ন
অফিস ঃ সাতান্ন ব্লক 'এ' বাঙুর এভিন্যু কলকাতা সাত লক্ষ পঞ্চান্ন

উৎসর্গ

টুটান জয়ন্তী
স্নেহভাজনেষু

নন্দিনী

মন দিয়ে একখানা চিঠি টাইপ করছিল নন্দিনী। মরগ্যান অ্যান্ড স্ট্যানলি কোম্পানির বড়সড় এক ক্লেমের জবাব। চিঠিটা নাকি কাল সকালেই ডেসপ্যাচ হবে।

বিমা কোম্পানির অফিস। ডালহৌসি পাড়ায়। জনা ষাটেক কর্মচারীর এই অফিসে ছুটকো-ছাটকার কোনও কারবার নেই, সবই প্রায় নামী-দামি কেস। লাখ লাখ টাকার ব্যাপার। সকালের দিকে এখানে কাজের চাপ খুব, টিফিনের পর তাও যা একটু ঢিলেঢালা ভাব আসে। তখন কেউ চেয়ারে বসে খানিক ঝিমিয়ে নেয়, কেউ বই ম্যাগাজিন বার করে ঝোলা থেকে, মেয়েরা উলকাঁটা। টুকটাক অলস আড্ডাতেও সময় কাটে কখনও সখনও। আবার কোনও কোনও দিন উটকো কাজের চাপও এসে পড়ে এই সময়টায়। তখন আবার ঘাড় গুঁজে বসো।

যেমন আজ। টিফিন সেরে প্রসন্ন মেজাজে নন্দিনী একটা ম্যাগাজিন বার করেছিল। দু চার পাতা উল্টোতে না উল্টোতে একতাড়া কাগজ ধরিয়ে দিয়ে গেল রথীনবাবু। আজই সব টাইপ করে দিতে হবে। এক্ষুনি।

রোলার থেকে কাগজ খুলে নন্দিনী চোখ বোলালো একবার। আলতো আড়মোড়া ভাঙল, ঘড়ি দেখল কবজি ঘুরিয়ে। চারটে দশ। ওফ্, এখনও সাতখানা লেটার টাইপ বাকি। আজ আর পাঁচটার আগে মুক্তি নেই।

শংকর এসে দাঁড়িয়েছে সামনে। হাতে একখানা বাদামি রঙের খাম।

নন্দিনী ভুরু কুঁচকোল, – ওটা আবার কী?

– এটা আপনার। পারসোনাল। বিকেলের ডাকে এল।

বাদামি খামে ব্যক্তিগত চিঠি? কে পাঠাল রে বাবা ?

খামখানা হাতে নিয়েই আমূল নাড়া খেয়ে গেছে নন্দিনী। মানকুণ্ডু উন্মাদ আশ্রম!

ওখান থেকে চিঠি কেন? বাবার কিছু হল নাকি? কিন্তু গত মাসেই তো নন্দিনী গিয়েছিল মানকুণ্ডু, তখন তো অমলেন্দুকে সুস্থই দেখে এসেছে। একটু সর্দিকাশি ছিল বটে, সিজন চেঞ্জের সময় ওটা হতেই পারে। বরং বাবার মুখচোখ সেদিন বেশ উজ্জ্বল ছিল। অনেক শান্তও। নন্দিনী প্রণাম করল, বাবা আশীর্বাদ

করল মাথায় হাত রেখে। বেশি কথা বলেনি, তবে বসেছিল পাশে। অনেকক্ষণ। সন্দেশ নিয়ে গিয়েছিল নন্দিনী, কী পরিপাটি করে খেল বাবা। ডক্টর কর বলছিলেন অনেকটাই নাকি উন্নতি হয়েছে। যদি এমনটা থাকে তাহলে হয়তো শিগগিরই বাবা ছাড়া পেয়ে যাবে।

সেই খবরই এল নাকি ? তাই হবে। খারাপ কিছু হলে ওরা তো বাড়িতে টেলিফোনই করত।

শংকর সরে যেতেই কাঁপা কাঁপা হাতে নন্দিনী খুলল চিঠিটা। একবার পড়ল, দু বার পড়ল .....। মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠছে ক্রমশ। খুশিতে লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ড।

বাবা তাহলে সত্যিই সুস্থ?

হৃদয়ের উত্তেজনা প্রশমিত করার জন্য নন্দিনী চিঠিটা খামে পুরে ফেলল। চোরা চোখে এদিক ওদিক তাকিয়ে নিল একটু। পাশেই কণিকার টেবিলের সামনে গল্প করছে দিলীপ, কী একটা কথা নিয়ে জোরে হেসে উঠল দুজনে। সুধন্য চা খেতে খেতে ফাইলে নোট লিখছে, ছায়াদি ডুবে আছে উলকাঁটায়। কেউই দেখছে না নন্দিনীকে। শান্তি।

পাগল বাবা সুস্থ হয়েছে, এই নিয়ে কোনও উচ্ছ্বাস কি অফিসে মানায়!

আবার রোলারে কোম্পানির লেটারহেড চড়াল নন্দিনী। এবার কদিন পর ভালো হল বাবা ? দেড় বছর ? না না, এক বছর আট মাস। গত বছরের আগের বছর এপ্রিলে গিয়ে নিয়ে এসেছিল বাবাকে, আবার আগস্ট মাসেই পাঠাতে হয়েছিল মানকুণ্ডু। টাইপরাইটারের চাবিতে আঙুল ছোঁয়াল নন্দিনী। খুট খুট শব্দ বাজাচ্ছে। এবারও সেই এপ্রিলেই চিঠিটা এল! এপ্রিলই কি বাবার শুভ মাস?

হঠাৎ মেশিনে চড়ানো কাগজটায় নন্দিনীর চোখ পড়েছে। এমা, এ কী হটরপটর আঙুল চালিয়েছে সে? মাত্র তিন লাইনেই এতগুলো ভুল! কী হচ্ছে কী যাচ্ছেতাই?

খুশিতেও কি মানুষের ভেতরটা টাল খেয়ে যায় ?

নতুন কাগজ নিয়ে ফের মনঃসংযোগের চেষ্টা করল নন্দিনী। কয়েক মিনিটের জন্য মন থেকে সরাতে চাইছে খামটাকে। পারছে কি? রোলারে পাক খাচ্ছে বাদামি খাম, ভুল আরও বেড়েই চলেছে। কোত্থেকে যেন এক গঙ্গাফড়িং উড়ে এসে ঢুকে পড়ল মাথার ভেতর, অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছে। গুনগুন গুনগুন .... আহ্, জ্বালাল তো!

হাল ছেড়ে দিয়ে টাইপরাইটারে মাথা রেখে নন্দিনী ঝিম বসে রইল খানিকক্ষণ। উঠল। সেকশান অফিসারের টেবিলে গিয়ে দাঁড়িয়েছে,– রথীনদা, একটা কথা ছিল।

বছর পঞ্চাশের রথীন হালদারের সরু লম্বাটে মুখে সর্বদাই এক পোঁচ বিরক্তি। দেখে মনে হয় কোষ্ঠকাঠিন্যে ভুগছে। ছুটির পর অফিসে ব্রিজ খেলার নেশা আছে ভদ্রলোকের, কিন্তু কাজের সময়ে বিটকেল রকমের সিরিয়াস। যেন তার একার ঘাড়েই চেপে আছে গোটা কোম্পানিটা!

রথীন গম্ভীরমুখেই জিজ্ঞেস করল, – কী হয়েছে?

নন্দিনী গলা নামাল, – যদি কাল ফার্স্ট আওয়ারে এসে কাজগুলো তুলে দিই খুব অসুবিধে হবে?

– কেন, আজ নয় কেন ?

– শরীরটা ভাল্লাগছে না। কেমন গা গুলোচ্ছে।

রথীন সন্দিগ্ধ চোখে নন্দিনীকে দেখল। গত চার বছর ধরেই নন্দিনী শরীর খারাপ বললে এইভাবেই তাকায়। যেন বিয়ে হওয়া মেয়েদের শরীর খারাপের একটাই অর্থ! বিরক্তি লাগে নন্দিনীর। রাগ হয়ে যায়।

বিরক্তিটা মনে চেপে নন্দিনী মুখটাকে করুণ করল, – সত্যি রথীনদা, বড্ড আনইজি লাগছে।

গোমড়া মুখে দেওয়াল ঘড়ির দিকে তাকাল রথীন, – এখনও কিন্তু পাঁচটা বাজতে অনেক দেরি।

নন্দিনী চুপ।

রথীন ফাইলে চোখ নামাল,– খুব শরীর খারাপ লাগলে আর কী হবে, চলে যাও। তবে কাল এসেই কিন্তু ...বারোটার মধ্যে কাল এজিএমের টেবিলে সব পুট আপ করতে হবে।

মনে মনে হাসল নন্দিনী। কাল তুমি আমায় আর পেয়েছ! কাল আমি মানকুণ্ডু যাবই। অতএব পরশুও ডুব। এ বছরে সবে মাত্র দুটো সিএল খরচা হয়েছে, কী করবে রথীন হালদার!

টয়লেটে এসে নন্দিনী মুখে-চোখে জল ছেটাল। উফ্, গরমও পড়েছে আজ, একটু যেন ঠাণ্ডা হল শরীর। চেপে চেপে তোয়ালে রুমালে মুছল ঘাড় গলা। বেসিনের আয়নায় ক্ষণিক দেখল নিজেকে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছে। কাল কি সে একাই যাবে? নাকি সুব্রতকে বলবে সঙ্গে যেতে? তার তো হাজারো বাহানা, কাল বললেই কাল যেতে পারবে বলে মনে হয় না। একা যাওয়ার

অসুবিধেই বা কী? এ তো আর পাগল মানুষকে রাখতে যাওয়া নয়। আগের বার অবশ্য আনতে গিয়েছিল সুব্রত। বাড়ি আসার পথে বাচ্চার মতো খুশিতে ডগমগ করছিল বাবা। গাড়িতে আসতে আসতে এটা দেখছে, ওটা জিজ্ঞেস করছে....। এবারও একটা গাড়ি ভাড়া করে নিতে হবে।

বাবার খবরটা কী ভাবে নেবে সুব্রত? খুশি হবে? নিরাসক্ত ভাবে শুনবে? তেমন আহ্লাদিত হওয়ার কথা নয় অবশ্য। গেল বার বাবা কম জ্বালিয়েছে সুব্রতকে। প্রথম কটা দিন মোটামুটি চুপচাপই ছিল, তারপর সুব্রতকে দেখলেই কেমন খেপে যেত। ইশ, কী সব বিশ্রী সিচুয়েশান হয়েছিল! সকালে খবরের কাগজ পড়ছে সুব্রত, ঝাং করে কেড়ে নিল হাত থেকে। সুব্রত যেই অফিস ফিরল, অমনি নিজের ঘরে ঢুকে দড়াম দরজা বন্ধ করে দিল বাবা। সুব্রত মন দিয়ে টিভিতে টেনিস দেখছে, রিমোটে চ্যানেল ঘুরে গেল হঠাৎ। কী, না এখন আমি পল্লীকথা দেখব! এক্কেবারে অবোধ শিশু যেন। সুব্রতকে যে পছন্দ করছে না, বুঝিয়ে দিতে কণামাত্র দ্বিধা নেই। রাত্রিবেলা তো আরও ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি। সুব্রত নন্দিনী বিছানায়, হয়তো ঘনিষ্ঠ মুহূর্ত, দুমদুম দরজায় করাঘাত। খুকু, আমার ভয় করছে! খুকু, তুই আমার কাছে চলে আয়! ব্যস, হয়ে গেল। মাথার পাশে গিয়ে বসে থাকো। কড়া কড়া ঘুমের ওষুধ পড়ছে, তবু স্নায়ু কী সজাগ! মানুষটা ঘুমিয়েছে ভেবে যেই না নন্দিনী উঠে আসতে যাবে, খপ করে চেপে ধরল মেয়ের হাত। যাস না খুকু! তুই আমার পাশে থাক লক্ষ্মীটি।

এক একদিন দাঁত কিড়মিড় করত সুব্রত। বলত,– এটা হচ্ছে কী নিনি? এটা কিন্তু ওঁর পজেসিভনেস নয়, শিয়ার পাগলামি। কিছু একটা করো।

– করছি তো। ডাক্তার তো দেখছেন রেগুলার।

– ভাল করে কথা বলো ডাক্তারবাবুর সঙ্গে। দরকার হলে ফের মানকুণ্ডু ট্রান্সফার করো। এরকম চললে আমি যে পাগল হয়ে যাব।

সেই মুহূর্তে সুব্রতকে স্বার্থপর মনে হয়েছিল নন্দিনীর। ভেবেছিল পিতৃস্নেহের গভীরতাটা সুব্রত হজম করতে পারছে না। হিংসে, স্রেফ হিংসে করছে। বাবাকে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবছে।

তারপর তো একদিন বাড়াবাড়িটা হয়েই গেল।

সেদিন দুজনেরই ফিরতে একটু দেরি হয়েছে। অনেক দিন পর সেদিন একটা নাটক দেখতে গিয়েছিল নন্দিনীরা। ভেবেছিল আটটা অবধি তো আয়া

আছেই, নটা সওয়া নটার মধ্যে ফিরে আসবে, কী আর এমন সমস্যা হবে একটা দিন! কিন্তু বাড়ি ঢুকেই স্তম্ভিত। দরজা হাট, বাবা নেই!

সঙ্গে সঙ্গে খোঁজ খোঁজ খোঁজ। উদ্‌ভ্রান্তের মতো দুজনে ঘুরছে রাস্তায় রাস্তায়। একে জিজ্ঞেস করে, ওকে জিজ্ঞেস করে, গলি পাড়া বেপাড়া স্থানীয় হাসপাতাল ...। হতাশ হয়ে যখন মাথার চুল ছিঁড়ছে, রাতদুপুরে থানায় ছুটবে বলে তৈরি হচ্ছে, তখনই পাড়ার একটি ছেলে এসে খবর দিল, বাঘাযতীন স্টেশনের দিকে নাকি যেতে দেখা গেছে অমলেন্দুকে, সাড়ে আটটা নাগাদ। সঙ্গে সঙ্গে ট্যাক্সি ধরে স্টেশন।

হ্যাঁ, সেখানেই পাওয়া গেল। প্ল্যাটফর্মের শেডের নীচে সিমেন্টের বেঞ্চিতে হাত পা ছড়িয়ে ঘুমোচ্ছে অমলেন্দু। ঠেলে তুলতেই চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে বসল। যেন কিছুই ঘটেনি এমন ভঙ্গিতে বলল, – ও, তুই এসে গেছিস? চল চল চল, খেতে দে। আমার বড্ড খিদে পেয়ে গেছে। এত রাত করলি কেন আজ, অ্যাঁ? আমি কতক্ষণ ধরে তোর জন্য বসে আছি!

রাতে সুব্রত বলেছিল, – কী, এখনও মানবে না ? মনে রেখো, আজ জ্যান্ত পেয়েছ, এরপর কিন্তু আর ...। ট্রেনে উঠে যদি কোথাও চলে যেতেন?

বুক হিম হয়ে গিয়েছিল নন্দিনীর। পরদিনই যোগাযোগ করল ডক্টর করের সঙ্গে। গম্ভীর মুখে সব শুনলেন ডাক্তারবাবু, তারপর তিনিও সুব্রতর সুরে সুর মেলালেন। কেসটা সত্যি খুব জটিল হয়ে গেছে। স্নায়বিক রোগের এই দশায় আর এক মুহূর্তও বাড়িতে রাখা নিরাপদ নয়। মনে রাখবেন, সেকেন্ড অ্যাটাক সব সময়ে প্রথম বারের চেয়ে মারাত্মক হয়।

অগত্যা ফের মানকুণ্ডু। সেদিন বাবাকে রেখে আসার সময়ে নন্দিনীর বুকটা সত্যিই ভেঙে গিয়েছিল। কী অসহায় ভাবে ছটফট করছিল বাবা, ঘাতকের কবলে পড়া পশুর মতো আর্তনাদ করছিল। আমায় ফেলে দিয়ে চলে যাস না খুকু, আমি মরে যাব, আমি মরে যাব...!

আশ্চর্য, সেই বাবাকে দেখতে যাওয়াটাও কী ভাবে কমে এল! প্রথমে হপ্তায় হপ্তায়, তারপর পনেরো দিনে একদিন, তারপর মাসে মাসে। কেন যে এমনটা হয়েছিল? অসুস্থ মানুষকে দেখতে যাওয়া রুটিনে পরিণত হয়ে গেছিল কি? শুধুই কর্তব্য পালন? নাকি মনের কোণে এমন ধারণা উঁকি দিয়েছিল বাবা আর সুস্থ হবে না ? ডক্টর কর জোরালো গলায় আশার বাণী শোনানো সত্ত্বেও?

নাহ্, এবার বাবাকে নন্দিনী তুলোয় মুড়ে রাখবে। অনেক কষ্ট পেল, এবার বাকি জীবনটা যেন বাবার সুখে কাটে।

সুখ অনেক বড় কথা। হে ঈশ্বর, বাবা যেন সুস্থ থাকে।

দুই

অমলেন্দু ছিল নেহাতই এক সাধারণ মানুষ। যাকে আমরা কথায় বলি গড়পড়তা মানুষ। চাকরি করত একটা সরকারি লাইব্রেরিতে। চেহারাও ভিড়ের মধ্যে লক্ষ করার মতো কিছু নয়। না ফর্সা, না কালো, না লম্বা, না বেঁটে, না মোটা, না রোগা ...., এমন বিশেষত্বহীন লোককে একবার দেখে দ্বিতীয় বার মনে রাখাটাই মুশকিল। ভাল করে গুছিয়ে কথাও বলতে পারত না অমলেন্দু। সে ছিল বেজায় মুখচোরা। গোবেচারা ধরনের।

তার ছিল একটাই শুধু সম্পদ। তার স্ত্রী রমলা।

রমলা ছিল অসামান্য সুন্দরী। তীক্ষ্ণ নাক, টানা টানা চোখ, টকটকে ফর্সা রঙ, পিঠ বেয়ে নেমে আসা এক ঢাল চুল...। পুরুষ মাত্রেই যে ধরনের রমণীর দিকে পতঙ্গের মতো ধাবিত হয়, রমলা ছিল সেই প্রজাতির নারী। চপল স্বভাব, চোখেমুখে কথা বলে, প্রায় অপরিচিত মানুষকেও অবলীলায় কটাক্ষ হানতে পারে – রমলা ছিল পাড়ার মক্ষিরানি।

মাত্র আঠারো বছর বয়সে অমলেন্দুকে বিয়ে করেছিল রমলা। হ্যাঁ, বিয়ে করেছিল, বিয়ে হয়নি। কেন করেছিল, কী ভাবে করেছিল, কী করে তাদের মধ্যে যোগাযোগ ঘটল, রমলার মতো ডাকসাইটে সুন্দরী কেন যে একজন হেঁজিপেজি লাইব্রেরিয়ানের প্রেমে পড়ল, সেটাই এক প্রহেলিকা। ছোটবেলা থেকেই রমলার সিনেমা থিয়েটারে অভিনয় করার শখ। কিন্তু তাদের বাড়ি অত্যন্ত গোঁড়া ধরনের, ওই বাড়িতে থেকে তার বাসনা সফল হওয়ার সম্ভাবনা ছিল অতি ক্ষীণ। সম্ভবত সেই কারণেই অমলেন্দুর মতো নিরীহ মানুষের কাঁধে ভর করেছিল রমলা। হয়তো ভেবেছিল অমলেন্দুর মতো ক্যাবলাকান্ত স্বামীকে শিখণ্ডী সাজিয়ে রেখে সে নিজেই ইচ্ছে মতো জীবন কাটাতে পারবে।

বিয়ের দু-চার মাসের মধ্যেই রমলার আসল রূপ ফুটে বেরোতে শুরু করল। প্রেম-টেম অনেক হল, এবার তুমি তোমার মতো থাকো, আমি আমার মতো থাকি! লোকজনকে ধরা-করা আরম্ভ হয়ে গেল তার। রূপমুগ্ধ এক মাঝারি মাপের অভিনেতার মাধ্যমে ঢুকেও পড়ল প্রফেশনাল বোর্ডে। অভিনয়ে সে খুব একটা দক্ষ ছিল না, তবু শুধু রূপের জোরেই অল্প দিনের মধ্যে মোটামুটি একটা জায়গাও করে ফেলল। ব্যস্, শুরু হয়ে গেল টালিগঞ্জ পাড়ায় হাঁটাহাঁটি।

সিনেমাতে রোলও জুটল কয়েকটা, ভ্যাম্প গোছের। দুম করে একদিন যাত্রাতেও নেমে পড়ল। কাগজে বিশাল বিজ্ঞাপনে তার নাম বেরোচ্ছে, ব্যস্ আর কী চাই!

নন্দিনী তখন এসে গেছে পৃথিবীতে। কিন্তু বাচ্চার টানে ঘরে বাঁধা থাকবে, রমলা সে ধাতের মেয়েই নয়। এক্কেবারে শিশু নন্দিনীকে ঘরে ফেলে রেখে যেখানে খুশি শো করতে চলে যায়, যখন তখন। বাড়ি ফেরার নির্দিষ্ট কোনও সময় নেই, কতদিন কত রাত সে তো আদৌ ঘরমুখোই হত না।

অমলেন্দুর মতো শান্ত মানুষও ক্রমে ধৈর্য হারাচ্ছিল। প্রথম দিকে মিনমিন করে প্রতিবাদ জুড়ত, –এবার সংসারের কথাও একটু ভাবো। মেয়েটাকে একটু অন্তত সময় দাও।

শুনেই রমলার সে কী চোটপাট,–তুমি আছ কী করতে? করো তো ওই চার পয়সার চাকরি, ছেড়ে দিয়ে ঘরে বসে মেয়ে সামলাতে পারো না? নোলক পরা বউ সেজে থাকার জন্য রমলা জন্মায়নি এ কথা তুমি জানতে না?

কাঁহাতক সহ্য হয়? অমলেন্দুও বাঁকা সিধে মন্তব্য জুড়তে আরম্ভ করল। তারপর থেকেই অনন্ত কলহপর্ব। বাড়ি থাকলেই রমলা চিলচিৎকার করছে, উঠতে বসতে অমলেন্দুকে গালাগাল করছে, এ তখন নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। অমলেন্দুও একদিন মরিয়া হয়ে বলেছিল, ইচ্ছে হলে রমলা যেখানে খুশি চলে যাক, সিনেমা থিয়েটারের লোক এনে বাড়িতে ঢলানি করা চলবে না। এটা ভদ্রলোকের বাড়ি, যখন তখন মদের আসর বসবে এ কেমন কথা? সঙ্গে সঙ্গে রমলার তুরন্ত জবাব, এক ডজন পুরুষ নিয়ে তোমার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করব, মুরোদ থাকে তো আটকাও।

নন্দিনী এসব দৃশ্যের অনেক কিছুই দেখেনি, বেশির ভাগ সময়ই সে থাকত মাসির বাড়িতে। অমলেন্দুই তাকে রেখে আসত। তবে শুনেছে। কিছুটা তার মেজমাসির মুখে, কিছুটা বা বলেছে তাকে মাসতুতো দিদি সরমা। খানিকটা পাড়াপড়শি আত্মীয়স্বজনের বাড়ির বাতাসে কান পেতে। অমলেন্দু রমলাকে নিয়ে কম চর্চা হত চারদিকে! এমন একটা মুখরোচক আলোচনা ... অভিনেত্রী বউ, মাতাল হয়ে রাতবিরেতে বাড়ি ফেরে, মেনিমুখো ভেড়ুয়া বরের কিচ্ছুটি করার ক্ষমতা নেই ...! আড়ালে আবডালে কানাকানিও হত, দ্যাখ ওই মেয়েও বাপটার কিনা! আসল বাপ হয়তো কোনও অন্য বৃন্দাবনে ঘুরে বেড়াচ্ছে!

অমলেন্দুর সঙ্গে নন্দিনীর সত্যিই তো কোনও মিল নেই। মায়ের মতো অত ফর্সা না হলেও মায়ের আদলটি তার বসানো। তার মায়াবী মুখখানাও যে রমলাকে টানতো না এটাও ভারী আশ্চর্যের।

তা সেই রমলা একদিন দুম করে মরেও গেল।

নন্দিনী তখন মাত্র ছ বছরের। সেদিনটা নন্দিনী বাড়িতেই ছিল। রাতভর বৃষ্টি পড়েছে ঝমঝম, ছোট্ট মেয়েটা ভোরবেলা ঘুম ভেঙে উঠে হতভম্ব। বাড়ি ভর্তি লোক, খাটে কেমন করে যেন শুয়ে আছে তার মা, সবজেটে গ্যাঁজলা জমাট বেঁধে আছে মার কষে। রমলার শিয়রের কাছে দাঁড়িয়েছিল অমলেন্দু, মুখ পাথরের মতো কঠিন।

বাড়িতে পুলিশ এসেছিল। প্রচুর জেরা করল অমলেন্দুকে, নন্দিনীর কাছ থেকেও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গুহ্য কথা জানতে চাইল, প্রতিবেশী আত্মীয়দেরও প্রশ্ন করল খুব। কিন্তু একজনও অমলেন্দুর বিরুদ্ধে কিছু বলেনি। কেন বলবে? রমলার স্বভাবচরিত্রের কথা জানতে কার বাকি ছিল? এ তো পরিষ্কার আত্মহত্যার ঘটনা। নির্ঘাৎ কোথাও ভাল মতো ফেঁসে গেছে...! যাত্রা সিনেমা থিয়েটার সর্বত্রই তো রমলা তখন প্রায় বাতিলের দলে, হয়তো সেই শোক ভুলতেই পৃথিবীকে টা টা করল রমলা!

যাই হোক, দুর্ঘটনার রেশ এক সময়ে থিতিয়েও গেল। শুরু হল এক নতুন অধ্যায়। নন্দিনী আর অমলেন্দুর। আগেও মেয়ে অন্ত প্রাণ ছিল অমলেন্দুর, এখন যেন মেয়েকে চোখে হারাচ্ছে। গোটা দুনিয়ায় তার যেন আর কেউ নেই, কিছু নেই, সর্বক্ষণ শুধু মেয়ে মেয়ে আর মেয়ে। নন্দিনীকে সাজাচ্ছে, নন্দিনীকে খাওয়াচ্ছে, ঘুম পাড়াচ্ছে...। স্কুলে পৌঁছে দিয়ে আসছে মেয়েকে, স্কুলের টিফিনটাইমে ছুটতে ছুটতে মেয়ের কাছে হাজির, আবার স্কুল ছুটির আগে গেটের ধারে এসে দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ।

নন্দিনীরই বা অমলেন্দু ছাড়া তখন আর কে ছিল? সারারাত বাবাকে জাপটে ধরে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজেছে মা-হারা মেয়েটা, অমলেন্দুর শরীরের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে বড় হয়েছে। তেরো বছর বয়সে সে যখন প্রথম রজঃস্বলা হল, তখনও সে বাবার মুখে শুনেই জানল আজ থেকে সে নাকি পুরোদস্তুর নারী।

ছবিটা অবশ্য চিরকাল একরকম রইল না। বদলাচ্ছিল। ধীরে ধীরে। তবে অমলেন্দুর চোখে নয়, নন্দিনীর কাছে। বাবাকে ঘিরে কেমন একটা লজ্জা লজ্জা ভাব তৈরি হচ্ছিল নন্দিনীর। একসঙ্গে শুতে সংকোচ হয়, স্কুলের সামনে বাবা দাঁড়িয়ে থাকলে অস্বস্তি হয় ...। তার বাবা যেন কী, আর কারুর বাবা তো এমন করে না? তার কোনও বন্ধু থাকতে পারবে না, খেলা থাকবে না, নিজস্ব কোনও কল্পনার জগত থাকবে না, সারাক্ষণ শুধু বাবার সঙ্গে তাকে লেপ্টে থাকতে হবে, এ কেমন কথা? একবার বুঝি কথাটা বাবাকে অভিমানের সুরে

বলেওছিল নন্দিনী, অমনি টানা দুদিন অন্নজল ত্যাগ, অমলেন্দু গুম। তা মেয়ের ওপর টানা অভিমান করে থাকারও ক্ষমতা কোথায় অমলেন্দুর? দু দিন পরেই মেয়ের হাত ধরে অনুনয় করছে, একা মানুষটাকে তুই আরও একলা করে দিতে চাস খুকু?

অগত্যা নন্দিনীও হাল ছেড়ে দিল। মেনেই নিল। সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল। তাছাড়া বাবা মুখ হাঁড়ি করে থাকলে নন্দিনীরও কি ছাই ভাল লাগে! এবং সেই সঙ্গেই নন্দিনী আবিষ্কার করল, বন্ধু-টন্ধুর সঙ্গে সে মেশে বটে, তবে গোটা দুনিয়ায় তার প্রকৃত সঙ্গী বলতে ওই একজনই। বাবা।

আবিষ্কারটা নন্দিনীকে অনেকটা স্থিত করেছিল। অমলেন্দুর ভালবাসার অত্যাচারকে আর তত অসহ্য মনে হচ্ছিল না নন্দিনীর। সে শাড়ি পরলে তার পানে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকে বাবা, তার দৃষ্টির স্তুতি উপভোগ করে নন্দিনী। নিত্যনতুন সালোয়ার কামিজে সাজিয়ে মেয়েকে নিয়ে বেড়াতে বেরোয় অমলেন্দু, অপার আনন্দে ছেয়ে যায় নন্দিনীর হৃদয়।

অমলেন্দু তখন আর নন্দিনীর চোখে শুধু বাবা নয়। তার চেয়েও যেন বেশি কিছু।

অবশ্য অমলেন্দু ছাড়া মনের কথা বলার মতো আর একজনও ছিল নন্দিনীর। মাসতুতো দিদি সরমা। কাছেই বাড়ি, হুটহাট আবির্ভূত হয়, তিন বছরের ছোট বোনের সঙ্গে থেকেও যায় কখনও সখনও। রাত জেগে জেগে কত যে রোমাঞ্চকর গল্প শোনাত সরমা।

ঘন ঘন প্রেমে পড়ার অভ্যাস ছিল সরমার। প্রতিটি প্রেমের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা বোনকে সে শোনাবেই। বিকাশ অঙ্কুর তপন কত জনের যে কত রকম স্বাদ!

নন্দিনীর গায়ে কাঁটা দিত,– তোর ভয় করে না সরমাদি?

– কীসের ভয়?

– এই যে ওরা তোর গায়ে হাত দিচ্ছে, চুমু খাচ্ছে ...

– তো? আমি কি ক্ষয়ে গেলাম? সরমা খিলখিল হাসত, –ওরে বোকা, এর একটা আলাদা মজা আছে।

– কী মজা?

– আছে। আছে। বলতে বলতে বোনকে জড়িয়ে ধরত সরমা। চকাস চকাস ঠোঁটে গালে বুকে চুমু খেত, – কেমন লাগছে অ্যাঁ? কেমন লাগে?

একটা অদ্ভুত উত্তাপ অনুভব করত নন্দিনী। নিষিদ্ধ পুলক যন্ত্রণা ভাঙত

শরীরে। নন্দিনী কেঁপে কেঁপে উঠত।

সরমা হাসির ঝরনা হয়ে যেত। ফিসফিস করে বলত, – এর চেয়েও বেশি, এর চেয়েও বেশি মজা। বাবার খাঁচা ছেড়ে বেরো, বুঝতে পারবি।

নন্দিনী শিউরে উঠত। এক মন তাকে বলে উড়ে যেতে, অন্য মন চোখ রাঙায়। নিনি, তোর বাবা জানলে কী হবে ভেবেছিস? বাবাকে দুঃখ দিস না নিনি।

তা সেই সরমা শেষ পর্যন্ত অঙ্কুর বিকাশ তপন কাউকেই বিয়ে করেনি। বাবা মার পছন্দ করা পাত্র ব্যাংক অফিসার উৎপল তালুকদারের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে সে এখন ভরপুর গৃহিণী। দু দুটো ছেলেময়ের মা।

সরমা যে তার মেয়েকে বখিয়ে দিতে পারে এমন কি সন্দেহ জেগেছিল অমলেন্দুর? নইলে তার আসা যাওয়াটা অমলেন্দুর না-পসন্দ হবে কেন? মুখে অবশ্য সে কিছু বলত না, হাবে ভাবে প্রকাশ করে ফেলত মনোভাবটা। সরমা এলেই ঘন ঘন ঘড়ি দেখছে, সরমা নন্দিনীর কথার মাঝে আচমকাই ঢুকে পড়ছে ঘরে, রাতে দু বোনের কণ্ঠস্বর শোনা গেলেই গলা খাঁকারি দিচ্ছে পাশের ঘর থেকে।

একদিন অবশ্য রাখঢাক মুছে গেল।

নন্দিনী তখন কলেজে সেকেন্ড ইয়ারে। রাতে খাবার টেবিলে সরাসরি সরমাকে ধরল অমলেন্দু,– হ্যাঁ রে, তুই রাত্তিরবেলা অন্য লোকের বাড়ি থেকে যাস কেন? বাবা মা কিছু বলে না ?

সরমা অবাক,–ওমা, বাবা মা কি বলবে? আমি তো মাসির বাড়ি এসেছি!

–মাসি, হুঁহু! সঙ্গে সঙ্গে অমলেন্দুর মুখ বেঁকে গেছে,–ওই ছিরির মাসির পরিচয় দিয়ে আত্মীয়তা জমাতে তোদের লজ্জা করে না?

অমলেন্দুর কথায় সরমা প্রচণ্ড আহত হয়েছিল সেদিন। তারপর থেকে আর কখনও সে রাত্রে থাকেনি, আসাটাও কমে গেল অনেক। নন্দিনী তার বাইরের জানলাটাও হারাল। এবং আর ভালো করে টের পেল মার প্রতি বাবার ঘৃণাটা কি তীব্র।

আবার বাইরের পৃথিবীতে এল নন্দিনী চাকরি পাওয়ার পর।

চাকরি করা নিয়েও কম বাধা পেতে হয়েছে নন্দিনীকে! অমলেন্দু তাকে যতই আড়াল করে রাখুক, বাইরের দুনিয়ার রোদ জল হাওয়ার এক অপ্রতিরোধ্য টান আছে। তেইশ চব্বিশ বছরের শিক্ষিত মেয়ে কদ্দিনই বা ঘরের গারদে আটকে থাকতে চায়? এ যে নির্জন তেপান্তরের মাঠে একা একা বসে থাকার

চেয়েও ক্লান্তিকর। হাঁপিয়ে উঠে নন্দিনী খবরের কাগজ দেখে চাকরির দরখাস্ত ছাড়তে শুরু করলো এক সময়ে। গোপনে। বাবাকে না জানিয়ে বিমা কোম্পানিতে চাকরির পরীক্ষাও দিয়ে এল। এটাই বুঝি ছিল তার জীবনের প্রথম বিদ্রোহ।

অমলেন্দু খবরটা পেল অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার আসার পর। প্রথমটা হতচকিত। তারপরেই এক কথায় নাকচ, না, না, চাকরি কেন করবি? অফিস-কাছারি মেয়েদের জন্য মোটেই ভাল জায়গা নয়।

–বারে, এত মেয়ে যে করে?

–যে করে করুক।.... বাড়িতে থাকতে তোর কি অসুবিধা হচ্ছে?

–সময় কাটে না বাবা।

–এটা একটা কথা হলো ? টিভি আছে, ভিসিপি আছে, যত খুশি সিনেমা দেখো। লাইব্রেরি থেকে বই এনে দিচ্ছি, বসে বসে পড়ো।

–তা হয় না বাবা।

–কেন হয় না?

নন্দিনীর চোখে জল এসে গিয়েছিল। বলতে ইচ্ছে করছিল, বাড়িতে বসে থেকে আমি পাগল হয়ে যাব বাবা। হয়তো আমারও মার মতো বিষ খেতে সাধ জাগবে।

অনেক কষ্টে একটা যুক্তি খাড়া করলো। নরম করে বলল,–ঠাণ্ডা মাথায় একটু ভাবো বাবা। তোমারও তো বয়স হচ্ছে, আজ না হয় কাল রিটায়ার করবে। কটা টাকা তুমি জমাতে পেরেছ? কতই বা পেনশন পাবে? আমায় যে তুমি লেখাপড়া শেখালে, সেটা আমি কাজে লাগাবো না? আমি রোজগার করলে তো তোমারই লাভ। বুড়ো বয়সে পায়ের ওপর পা তুলে খেতে পারবে।

অমলেন্দু আর তত জোরালো গলায় নিষেধ করতে পারেনি। মনে মনে পুলকিত হয়েছিল কি? মেয়ে তার বাবার কথা ভাবছে বলে?

তা যে কারণেই হোক, অনুমতি মিলল। কিন্তু দেখা দিল অন্য সমস্যা।

প্রথম দিন অফিস থেকে ফেরার পথে দেখল বাবা দাঁড়িয়ে আছে বাসস্টপে। দ্বিতীয় দিনেও তাই। তৃতীয় দিনে একেবারে অফিসের দরজায়।

দু তিন দিন অফিসে নিতে যাওয়ার পর নন্দিনী হাউমাউ জুড়ে দিল, – তুমি কি বাবা? কেন এমন করছ?

অমলেন্দু কাঁচুমাচু মুখে বলল, – আমার বড্ড ভয় করে যে।

– কিসের ভয়?

– তুই যদি হারিয়ে যাস? তোর যদি কিছু হয়ে যায়?

– আমি কি কুচি খুকি? রাস্তাঘাটে চলতে জানি না? কলেজে যাইনি আমি?

–কলেজ তো ছিল তিন বছরের। এ তো সারা জীবন....। অফিসে কত ধরনের মানুষ থাকে...

–তারা বুঝি তোমার মেয়েকে রসগোল্লা ভেবে টপ করে গিলে নেবে? আসল কথা বলো, তুমি আমায় বিশ্বাস করো না।

অমলেন্দু চুপ হয়ে গিয়েছিল। কাজটা যে শোভন হচ্ছে না বোধহয় বুঝতে পেরেছিল। অন্তত তখনও পর্যন্ত শোভন-অশোভন বোঝার মতো চেতনা ছিল অমলেন্দুর।

রাস্তায় আর দাঁড়িতে থাকতো না অমলেন্দু, মেয়ের জন্যে উদগ্রীব হয়ে প্রতীক্ষা করতো বাড়িতে। নন্দিনী ফিরলেই শুরু হয় জেরা। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করে অফিসের কথা, সহকর্মীদের কাহিনী। বাবার প্রচ্ছন্ন উদ্বেগ কাটাতে একটা মজার খেলা খেলতে লাগল নন্দিনী। সহকর্মীদের সম্পর্কে বিচিত্র বিচিত্র গল্প বানাতো। টগবগে যুবক দিলীপকে বানিয়ে দিল ট্যারা দিলীপ, হাস্যমুখ সুধন্যকে পেঁচামুখ টেকো সুধন্য, অ্যাথ্‌লিট সুপ্রভাতকে কোলকুঁজো সুপ্রভাত। প্রত্যেকেই যেন ক্লাউন। প্রত্যেকেই যেন নন্দিনীর চোখে একান্তই হাস্যকর জীব। খেলাটা চমৎকার কাজে লেগে গেল। অমলেন্দু মোটামুটি নিশ্চিন্ত। মেয়েকে নিয়ে তার দুশ্চিন্তাও কমে যাচ্ছিল ক্রমশ। মেয়ের চাকরিও মেনে নিল শান্ত ভাবে। নন্দিনীও হাঁপ ছেড়ে বাঁচল যেন। আহ্‌,মুক্তি।

এমনই এক সময়ে নন্দিনীর জীবনে সুব্রতর উদয়। প্রায় ধুমকেতুর মতো।

শহরে সেদিন তুমুল উত্তেজনা। রাজভবনের দিক থেকে ধেয়ে আসা এক মিছিলে পুলিশ গুলি চালিয়েছে, ছত্রভঙ্গ জনতা আগুন লাগিয়েছে বাসে-ট্রামে, দুপুর থেকেই রাস্তায় যানবাহন প্রায় উধাও।

অফিস থেকে তাড়াতাড়িই বেড়িয়ে পড়েছিল নন্দিনী। গাড়িঘোড়া নেই, চতুর্দিকে থিকথিকে ভিড়, কী করে যে ফিরবে? ইতিউতি তাকাচ্ছে, বুকে টিপটিপ উত্তেজনা, হঠাৎ সামনে এক ফাঁকা ট্যাক্সি। যেন প্রায় ঈশ্বরপ্রেরিত।

হাত দেখাতে দাঁড়িয়েও গেল ট্যাক্সিটা। দরজা খুলে সিটে বসতে গিয়ে নন্দিনী থতোমতো। আর একজন উল্টোদিকের দরজা দিয়ে আগে ভাগেই উঠে বসে পড়েছে। নন্দিনী রেগে আগুন। ঝগড়া করা তার ধাতে নেই। চোয়াল শক্ত করেই সে নেমে পড়ছিল, সুব্রত হাঁ হাঁ করে থামাল,–করেন কী? করেন কী? নেমে গেলেন কেন?

নন্দিনী কেঠো গলায় বলল,–থাক। আপনি আগে উঠেছেন আপনিই যান

–কিন্তু আপনাকেও তো ফিরতে হবে। আসুন না, শেয়ার করি।

–মানে? আমরা কে কোন দিকে যাব তার ঠিক নেই...?

–আমরা এক দিকেই যাব।

–কী করে বুঝলেন?

–ইনট্যুইশান। সুব্রত রহস্যময় ভঙ্গিতে হেসেছিল,–আপনি কি অস্বীকার করতে পারেন আপনি রূপবাণী সিনেমার সামনে থেকে বাসে ওঠেন?

সুব্রতর কথায় এমন একটা মজারু ভাব ছিল, নন্দিনীর রাগটা ঝপ করে নিবে গেল।

সেই শুরু। তারপর কখন যেন আলাপটা হৃদ্যতার দিকে গড়িয়ে গেল। কাছেই থাকত সুব্রত, হরি ঘোষ স্ট্রিটের একটা মেসে। অতি দ্রুত তারা নেমে এল আপনি থেকে তুমিতে, তারপর পরস্পরের জন্য অপেক্ষা করা, অজস্র অর্থহীন সংলাপে জড়িয়ে যাওয়া, একদিন না দেখা হলে মন খারাপ হওয়া...

আশ্চর্য, বাবাকে কিন্তু কিছুতেই সুব্রতর কথা বলতে পারেনি নন্দিনী। বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যা চেহারা দিয়েও নয়। কোথায় যেন বাধছিল। সুব্রতর সঙ্গে সম্পর্ক যত গাঢ় হচ্ছে, বাবার কাছে ততই যেন আড়ষ্ট নন্দিনী। টের পাচ্ছিল ছুটির দিনে আর বাড়িতে তার ভাল লাগে না, অফিস যেন আয়ানগৃহ, বার বার চোখ চলে যায় ঘড়ির কাঁটায়। কখন যে পাঁচটা বাজবে?

নন্দিনী নিজের ওপর কূপিত হচ্ছিল। তার এই চিত্তচাঞ্চল্য কি বাবার সঙ্গে প্রতারণা নয়?

একদিন গঙ্গার ধারে বসে মরিয়া হয়ে সুব্রতকে বলেই ফেলল,–এবার বোধহয় আমাদের সম্পর্কটার ইতি হয়ে যাওয়া দরকার।

সুব্রত যেন আকাশ থেকে পড়ল,–কেন, কী অপরাধ করলাম?

–অপরাধ তুমি কেন করবে। অপরাধ আমার।

–বুঝলাম না।

–বোঝার প্রয়োজন কী? মনে করো না, পথে একজনের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, কিছু দূর পর্যন্ত একসঙ্গে পাশাপাশি হেঁটেছ, এবার যে যার পথে চলে যাব...।

–ও সব নাটুকেপনা ছাড়ো। সাফ সাফ বলো তো তোমার কী হয়েছে? ডু ইউ লাভ সামওয়ান এলস্? আমাকে তোমার অযোগ্য মনে হয়?

–না। কক্ষনো না। নন্দিনী হু হু করে কেঁদে ফেলেছিল। তক্ষুনি বাবার কথা ঠোঁটে আসেনি। মনে পড়েছিল যাকে সব থেকে বেশি ঘৃণা করে তার

কথা। বলেছিল,–আমি তোমার যোগ্য নই।

–মানে?

–তুমি আমার কতটুকু জান? আমার মা খুব ভালো ছিল না। অনেক বদনাম ছিল মার। এমন কিছু কাণ্ড ঘটিয়েছিল যার জন্য তাকে সুইসাইড পর্যন্ত করতে হয়। মিথ্যা বলছি না, তুমি খবর নিয়ে দেখতে পারো।

– এ সব তুচ্ছ সত্যি-মিথ্যেয় আমার কী এসে যায়? আমি তো তোমাকে চাই। তোমার মাকে নয়।

বিনবিন করে আরো অনেক কথা বলেছিল সুব্রত। চোখ ফোটার আগেই বাবা মাকে হারিয়েছে সে, সারাটা জীবন কাকার সংসারে কুঁকড়ে কুঁকড়ে থেকেছে, কখনোও কোথাও এতটুকু ভালোবাসা সে পায়নি। নন্দিনী তার চোখে আকাশের চাঁদ। চাঁদ তার কাছে এসেছিল, আবার দূরে সরে যাবে?

নন্দিনী পারল না। ভেসেই গেল। ভালোবাসা বুঝি এমনই দুকূলপ্লাবী হয়!

গোপনে একদিন রেজিস্ট্রিটা সেরে ফেলল নন্দিনী। পিছুটান অতিক্রম করে। বিয়ের সাক্ষী ছিল সরমা আর উৎপল। পরদিন বিকেলে সুব্রতকে বাড়ি নিয়ে এল। পা কাঁপছিল খুব, হৃৎপিণ্ড ধড়াস ধড়াস, তবু কপাল ঠুকে বাবাকে বলেই ফেলল।

অমলেন্দু প্রথম চোটে কেমন যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। নন্দিনী যেন হিব্রুতে কথা বলছে তার সঙ্গে। পরক্ষণেই ডুকরে কেঁদে উঠেছে,–তুই আমাকে ছেড়ে চলে যাবি খুকু?

সুব্রতর মাথাটা খুব সাফ। অ্যাকাউন্টস্ লাইনের ছেলে, সংসারের ডেবিট ক্রেডিট সে ভালোই বোঝে। সঙ্গে সঙ্গে হাল ধরেছে,– আপনি ভাবলেন কী করে নন্দিনী আপনাকে ছেড়ে চলে যাবে? আমি তো মেসে থাকি, আপনার মেয়েকে কি আমি সেখানে নিয়ে গিয়ে তুলতে পারব?

অমলেন্দু ফ্যাল ফ্যাল তাকিয়ে।

সুব্রত ফের বলল,–আমরা এখনও ঘর ঠিক করিনি। আপনি যদি অনুমতি করেন আমরা এখানে এসেও থাকতে পারি।

নন্দিনী হাত ধরল অমলেন্দুর,–বাবা প্লিজ....

অমলেন্দু শুধু একবার ভয়ঙ্কর শীতল চোখে দেখেছিল মেয়েকে। তারপর হাত ছাড়িয়ে সোজা শোওয়ার ঘরে।

অমলেন্দুর অসুখটার শুরু সেদিন থেকেই। অবশ্য তার আগেও সে কখনও

সুস্থ ছিল কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন জাগতেই পারে। তবে নন্দিনীরা সিমলায় দিন দশেকের হানিমুন সেরে এসে যা দেখল সে অতি ভয়ানক পরিস্থিতি। অমলেন্দু তখন প্রায় বদ্ধ উন্মাদ। সারাক্ষণ ঘাড় ঝুলিয়ে একভাবে বসে, ডাকলে সাড়া দিচ্ছে না, দৃষ্টি ঘোলাটে, খাওয়া দাওয়াও প্রায় ত্যাগ করেছে। দেখে মনে হয় যেন এক জীর্ণ ইমারত নিঃসাড়ে অপেক্ষা করছে পতনের।

প্রচুর ডাক্তার বদ্যি করেছিল সুব্রত নন্দিনী। তখন নন্দিনীর কেবলই মনে হত বাবার এই অসুস্থতার জন্য সেই বুঝি দায়ী। অমলেন্দু যে মেয়ের ব্যাপারে অসম্ভব অধিকারপ্রবণ এ তো জানাই ছিল। তবু কেন যে মরতে তাড়াহুড়ো করে বিয়েটা সারতে গেল? আর একটু রয়ে সয়ে, বাবাকে ভালো করে বুঝিয়ে সুঝিয়ে পা বাড়ানোই কি উচিত ছিল না? আত্মসুখটাই বড় হয়ে গেল তার কাছে? বাবাকে সে জেনে শুনে আঘাত দিল?

সুব্রতই তখন নন্দিনীকে সামলেছে। সুব্রতই প্রাণপণে চেষ্টা করেছে তার অপরাধবোধটা কাটানোর । শ্বশুরমশাইয়ের চিকিৎসার অনেকটা দায়িত্বই সে স্বেচ্ছায় ঘাড়ে তুলে নিয়েছিল।

প্রথমে কলকাতার এক মানসিক চিকিৎসালয়ে রাখা হল অমলেন্দুকে। মাসখানেকের মতো। তেমন উন্নতি হচ্ছিল না বড় একটা, আরও যেন অবসন্ন হয়ে পড়ছিল সে। তখনই সরমার দেওরের মাধ্যমে নামী মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টর সুশীল করের সঙ্গে যোগাযোগ। তিনি রুগিকে দেখলেন ভালো করে, পরীক্ষাও করলেন কিছু। তাঁরই পরামর্শে মানকণ্ডুর উন্মাদ আশ্রম।

বাবাকে অত দূরে পাঠানোর ইচ্ছে ছিল না নন্দিনীর। পরে ভেবে দেখল অমলেন্দু কত দিনে সারবে ঠিক নেই, দীর্ঘকালীন চিকিৎসার বিশাল একটা ব্যয়ভারও আছে, সব থেকে বড় কথা ডক্টর কর আছেন মানকুণ্ডুতে, তাঁর ওপর অনেকটা আস্থা রাখা যায়।

সেবার অবশ্য সুস্থ হতে খুব বেশি দিন সময় লাগলো না। মাত্র ছ মাসের মাথায় তাকে ফিরিয়েও আনা হল। ফিরে মাস দেড় দুই ভালোই ছিল অমলেন্দু, তারপর আবার ধীরে ধীরে মাথা চাড়া দিল রোগটা। এবার আরও মারাত্মক ভাবে।

ফের চেষ্টা। ফের ছোটাছুটি। ফের সেই মানকণ্ডুতে রেখে আসা।

এবার লাগল কুড়ি মাস।

এতদিন পরে সুস্থ হয়েছে বলে নন্দিনী আজ এত খুশি, এত উৎফুল্ল।

তবু একটা সংশয় তো থেকেই যায়। আজ কী হবে, কাল কী হবে, পরশু,

তরঙ্গ, তার পরের দিন....?

তিন

সুব্রত টিভি দেখছিল। ডিসকভারি চ্যানেল। প্রাচীন এক সভ্যতার ইতিহাস। কোন এক মরে যাওয়া নদীখাতে খননকার্য চালিয়ে হারিয়ে যাওয়া এক জনপদের সন্ধান মিলেছে তারই আনুপূর্বিক বিবরণ। সুব্রত এই ধরনের প্রোগ্রামই পছন্দ করে বেশি । কিম্বা খেলাধুলো। টিভির সিনেমা সিরিয়াল তার দু চক্ষের বিষ।

নন্দিনী হুড়মুড়িয়ে ঢুকল ফ্ল্যাটে, হাতে প্লাস্টিকের প্যাকেট। ড্রয়িংরুমের লম্বা সোফাটায় রাখল জিনিসগুলো, বসে পড়ে হাঁপাচ্ছে।

সুব্রত ভুরু কুঁচকে তাকাল,–এত মার্কেটিং কিসের? কোনও ডিএ টিএ পেলে নাকি?

–উঁহু, বোনাস। নন্দিনী আঁচলে কপাল মুছল,–জানো, একটা গ্র্যান্ড নিউজ আছে।

–এক সেকেন্ড। লেট মি গেস। সুব্রত রিমোট চেপে টিভি কমাল, –তোমাদের আবার পে কমিশান বসছে!

–ত্যাৎ, এই তো সবে নভেম্বরে আগের পে কমিশানের এরিয়ার পেলাম।

–প্রমোশন হল নাকি? কী একটা সিনিয়র স্কেল পাবে বলছিলে না?

–তুমি কি এর বাইরে কিছু ভাবতে পারো না? নন্দিনী ভুরু নাচাল,– সত্যিকারের গুড নিউজ। জানো, বাবা ভালো হয়ে গেছে।

–যাহ্।

–হ্যাঁগো, আজ অফিসে চিঠি এসেছে।

–অফিসে? অফিসে কেন? ওদের কাছে তো বাড়ির ফোন নম্বর দেওয়া আছে, ঠিকানা আছে...

–বা রে, সেবার একটা চিঠি মিসিং হল না ? সেই পুজোর আগে ? কয়েকটা ফরেন মেডিসিনের জন্য ওরা টাকা জমা করতে বলেছিল, অষ্টমীর দিন গিয়ে আমি জানতে পারলাম.....? তখনই তো বলে এসেছি এবার থেকে অফিসের অ্যাড্রেসেই সব করেসপন্ডেস....

–অ। সুব্রতর মুখে ছায়া পড়ল,–তুমি কিন্তু আমায় জানাওনি।

–বলিনি? নন্দিনী ঈষৎ অপ্রস্তুত। পরক্ষণে পাল্টা অনুযোগের সুরে বলল, – সারাদিনে আমাদের কটাই বা কথা হয় ? হয় নটা দশটা অবধি অফিস করছো, কিম্বা তাড়াতাড়ি এলে টিভির দিকে তাকিয়ে আছ। রাত্রে শোওয়ার সময়ে আমার সব কথা মনে থাকে না।

—এটা কি না মনে রাখার মতো কথা?

—বা রে, আমি কি ইচ্ছে করে বলিনি?

—সে তুমিই জানো।

আজকাল এভাবেই কথা হয় দুজনের। অতি তুচ্ছ স্ফুলিঙ্গ থেকে জ্বলে ওঠে আগুন। ফাঁকা ঘর বলেই কি ঠোকাঠুকি লাগে বেশি? অন্য দিন জবাব পাল্টা জবাবে সন্ধেটা হয়তো তেতো হয়ে যেত। আজ নন্দিনী সেদিকে গড়াতে দিল না। হেসে বলল,—সরি।

সুব্রতর কপালের ভাঁজ সরল। প্যাকেটগুলো দেখিয়ে বলল,—তা এ সব কী?

—এক সেট পাজামা পাঞ্জাবি কিনলাম বাবার জন্যে। আর এই লুঙ্গি তোয়ালে...তোমারও একটা পাঞ্জাবি আছে।

—আবার আমার কেন?

—ইশ, না আনলেই তো গাল ফোলাবে। ধরে নাও নববর্ষের উপহার।...যাক গে যাক, কাজের কথা শোন। কাল তুমি যাবে আমার সঙ্গে?

—কোথায়?

—কোথায় আবার? মানকুণ্ডু।

—কালই যাবে?

—ওরা লিখেছে অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল্ নিয়ে যান।

—তা বলে কালই?

—দেরি করব কেন? মানুষটা যদি সুস্থ হয়ে গিয়েই থাকে, মিছিমিছি একগাদা পাগলের মধ্যে পড়ে থাকবেই বা কেন?

—হুম, এটা অবশ্য একটা ফ্যাক্টর বটে। সুব্রত সিগারেটের প্যাকেট টানল। একখানা সিগারেট বার করে লাগিয়েছে ঠোঁটে, তবে ধরাল না। ভাবছে কী যেন।

নন্দিনী অসহিষ্ণু মুখে বলল,—ধ্যান কোরো না । না যেতে পারলে বলে দাও।...আর কার-রেন্টালে একটা খবর দিয়ে এসো।

—হুম্।..আমি ভাবছি অন্য কথা।

—কী?

—আমাকে দেখলে ওঁর যদি আবার কোনও রিঅ্যাকশন টিঅ্যাকশান ...

—থাকবে তো এখানেই। হওয়ার হলে তখনো তো হবে।

সুব্রত আর কিছু বলল না। যাবে কি যাবে না আন্দাজ করার চেষ্টা করল

নন্দিনী। বুঝতে পারল না। চমৎকার মনের ভাব গোপন করতে পারে সুব্রত। তার মুখ দেখে হৃদয়ের ভাষা অনুমান করা কঠিন।

জিনিসপত্রগুলো নিয়ে উঠে পড়ল নন্দিনী। চলে গেছে শোওয়ার ঘরে। আজ বিচ্ছিরি ভ্যাপসা গরম ছিল, গা চিটপিট করছে, শাড়ি জামা নিয়ে সোজা বাথরুমে। শাওয়ারের নীচে দাঁড়িয়ে ভেবে ফেলল কী ভাবে চটপট বাবার ঘরটা রেডি করে ফেলবে। খাটটা একটু ঠেলে দিলে হয় জানালার দিকে। দক্ষিণের জানালা,বাবা হাওয়া পাবে ভালো। টেবিলটাকে খাটের পাশে সরিয়ে আনতে হবে, ওখানে ওষুধ থাকবে। ওষুধপত্র হাতের কাছে থাকাই উচিত। পিংক মশারিটা কাচাই আছে, রাত্রে বের করে রাখবে আলমারি থেকে। কাল সকালে কমলার মা এলেই ফিনাইল দিয়ে ভালো করে ধোয়াতে হবে ঘরখানা। খাটের তলাটাও সাফসুফ করাতে হবে। একটু ফুল এনে রাখতে পারলে বেশ হতো। যাগ গে, কাল ফেরার পথেও কেনা যেতে পারে।

স্নান সেরে বেরিয়ে নন্দিনী দেখল দুকাপ কফি বানিয়ে ফেলেছে সব্রত। মুখ টিপে হাসল নন্দিনী। নাহ্, মেজাজ তবে বাবুর ঠিকই আছে। মন প্রসন্ন থাকলে নিজে থেকে চা কফি বানায় সুব্রত। গত হপ্তা অবধি অফিসের বর্ষশেষ হিসেবনিকেশ নিয়ে ব্যস্ত ছিল, তখন সারাক্ষণই টঙে চড়ে থাকতো মেজাজ। কুটোটি নাড়তে হলেও তখন কী দাঁত মুখ খিঁচুনি।

গায়ে মুখে হালকা পাউডার থুপে ড্রয়িংরুমে ফিরল নন্দিনী। বসল সুব্রতর পাশটিতে।

সুব্রত আবার ডুবে গেছে রঙিন পর্দায়। নন্দিনী কফিতে চুমুক দিল। শ্রান্তি কাটছে। স্মিত মুখে বলল,– কাল বাজার থেকে পাকা রুই এনো তো। বাবা দইমাছ ভালোবাসে। রেঁধে রেখে যাব।

ঘাড় ঘোরাল সুব্রত, –রান্নাবান্না করবে..সকালে বেরোবেটা কখন?

–এই ধরো এগারোটা সাড়ে এগাররোটা নাগাদ। খেয়ে দেয়ে।

–দুপুরবেলা রোদ মাথায় করে যাবে, আসবে.....?

–ওখানে কতক্ষণ লাগে তার ঠিক কী? তাড়াতাড়ি হয়ে গেলে না হয় একটু বসেই থাকবো।

–ফল টল কিছু আনতে হবে বাজার থেকে? উনি তো আঙুরটা খুব.....

–এনো। পেলে তরমুজও। বাবা তরমুজ বড় তৃপ্তি করে খায়। আর একটা হরলিক্স।

–বেশ..... নার্সেস সেন্টারে একটা খবরও তো দেওয়া দরকার? আয়া

লাগবে তো?

–খোঁজ কোরো তো মান্থলি বেসিসে পাওয়া যায় কি না। তা হলে টাকাটা একটু কম হবে।

–সে দেখা যাবেখন।

ফোন বাজছে। উঠে গিয়ে রিসিভার তুলল নন্দিনী,–হ্যালো?

–এই খুকু, শোন। ও প্রান্তে সরমার গলা,–সতেরো তারিখের কথাটা তোর মনে আছে তো?

নন্দিনী চট করে মনে করতে পারল না,–কী আছে সতেরো তারিখ?

–তুই কী রে? কিছু মাথায় থাকে না? সতেরোই টাবলুর জন্মদিন না? এবার একটু বড় করে করছি রে, পাঁচ বছর হচ্ছে তো....

–ও হ্যাঁ, তাই তো!

–সুব্রতকে কিন্তু ধরে আনবি। কোনও ট্যাঁ ফোঁ চলবে না। গতবার সুব্রত ডুব মেরে দিয়েছিল, তোর উৎপলদা কিন্তু ভোলেনি।

–গতবার ও খুব কাজে ফেঁসেছিল গো, এবার যাবে।...এই সরমাদি, একটা দারুণ খবর আছে। নন্দিনী উত্তেজনাটা চেপে রাখতে পারল না। সরমার সঙ্গে সেই পুরানো সখিত্ব নেই বটে, তবে এখনো সে অনেকটা কাছের। সময়ে অসময়ে সরমা তাকে বুদ্ধিও দেয়। গড়গড় করে নন্দিনী তার নিজের সমাচারটা উগরে দিল।

ও প্রান্ত একটুক্ষণ প্রতিক্রিয়াহীন। তারপর স্বর ফুটেছে,–মেসোকে আবার তোদের কাছেই নিয়ে আসছিস?

নন্দিনী থমকাল,–বাবা আর কার কাছে যাবে?

–তা ঠিক। নিয়ে আয়। কিন্তু....

–কিন্তু কী?

–গতবার সুব্রতর ওপর দিয়ে তো অনেক ঝড়ঝাপটা গেছিল.....

–সুব্রতর আপত্তি নেই। নন্দিনী ঝটিতি বলে উঠল,–সুব্রতর সঙ্গে আমার কথা হয়ে গেছে।

–আহা, সুব্রত কি আর মুখ ফুটে কিছু বলবে? সরমা গলা ভারি করল,–বি প্র্যাক্টিকাল খুকু। তোর কাছে থাকলে মেসোর যদি আগের উপসর্গগুলো আবার মাথা চাড়া দেয়? সেবার সুব্রত মুখ বুঝে সহ্য করেছে, এবার নাও করতে পারে। তোকে তো সুব্রতর কথাটাও ভাবতে হবে।

–বা রে, তা বলে আমার বাবাকে আমি নিজের কাছে রাখতে পারবো না?

—সমস্যাটার কথা তোকে জাস্ট জানিয়ে দিলাম। তারপর তুই যা ভালো বুঝিস কর। আমি তোর জায়গায় হলে কোনও একটা ওল্ড এজ হোম টোমের কথা ভাবতাম।

—হোম? মানে...বাবা বৃদ্ধাবাসে থাকবে?

—কেন, ওল্ড এজ হোম কী খারাপ জায়গা? বরং ভালোই হবে। মেসো সেখানে কত বন্ধু পেয়ে যাবে, পাঁচজনের সঙ্গে মিশতে পারবে...একটা অন্য রকম পরিবেশ.....। হোমের নিজস্ব ডাক্তার থাকে, চেক আপটাও চলবে নিয়মিত। ভেবে দ্যাখ তোরা সারাদিন বাড়িতে থাকবি না, মেসো সারাক্ষণ একা... এর থেকেও তো নতুন কম্প্লিকেশন আসতে পারে।

—হুঁ।

বাবার একা থাকার সমস্যাটা নিয়ে নন্দিনী ভেবেছে বৈকি। কিন্তু কিছু করারও তো নেই। সকাল সন্ধে যতটা সম্ভব সে অবশ্যই এবার থেকে সঙ্গ দেবে বাবাকে। এ তো তার শুকনো কর্তব্য নয়, এ তার প্রাণের টানও। বাবা যে তাকে কতটা চায়, নন্দিনীর চেয়ে বেশি কে জানে!

সরমা একবার শুরু করলে তাকে থামানো কঠিন। তার গলা বেজেই চলেছে,—শোন খুকু, তোর উৎপলদার পাইকপাড়ায় একটা হোমের সঙ্গে জানাশোনা আছে। যদি বলিস তো চেষ্টা চরিত্র করে দেখবে।....অবশ্য চাইলেই তুই জায়গা পাবি না, অনেক ধরাকরা করতে হয়, প্রচুর দরখাস্ত থাকে। হাতি-বাগান থেকে পাইকপাড়া তো কাছেই,যখন ইচ্ছে যাবি, দেখে আসবি....। ইচ্ছে হলে মাঝে মাঝে মেসোকে এনেও রাখতে পারিস।..... এসব অসুখ পুরো সারে না রে, তোদের মধ্যে একটু ব্যবধান থাকা বোধহয় ভালো।

-হুঁ।

—টাবলুর জন্মদিনে তাহলে মেসোকে নিয়ে আসিস। মা আসবে, সবাই মেসোকে দেখলে খুশিও হবে।

—হুঁ।

—আসিস কিন্তু...সতেরো তারিখ। গুবলেট করে দিস না। ছাড়ছি, অ্যাঁ?

ফোন রেখে দিয়ে একটুক্ষণ থম মেরে দাঁড়িয়ে রইল নন্দিনী। এরা সবাই বাবাকে বাতিলের দলে ফেলে দিচ্ছে কেন? আশ্চর্য, ভাবেটা কী? নির্বাসন থেকে ফিরিয়ে এনে ফের নির্বাসনে পাঠাবে নন্দিনী? কখনও না। প্রাণ থাকতে নয়।

ফিরে এসে থমথমে মুখে নন্দিনী সোফায় বসলো।

সুব্রত বোধহয় আঁচ করেছে। প্রশ্ন জুড়ল,—কার ফোন ছিল?

—সরমাদির।

—কী বলছিল?

—তেমন কিছু নয়। নন্দিনী মাথা দোলাল দুদিকে,—টাবলুর জন্মদিন। যেতে বলল।

সুব্রত তবু কেমন অদ্ভুত চোখে চেয়ে আছে। এক দৃষ্টে। কী দেখে? নন্দিনীর খুশিটা মিইয়ে যাওয়া ? কে জানে!

চার

মানকুণ্ডু থেকে ফেরার পথে ঝড় উঠেছিল একটা। সন্ধের ঠিক মুখে মুখে। কালবৈশাখি। বৃষ্টি হয়নি তেমন, দু'চার দানা ঝরল কি ঝরল না, তবে ধুলোয় ধুলোয় আঁধার হয়ে গিয়েছিল দশদিক। লাভের মধ্যে লাভ, কদিনের গুমোট গরম ঝাপটা খেয়ে উধাও।

বাড়ি এসেই বাবাকে আগে শুইয়ে দিল নন্দিনী। এতটা রাস্তা গাড়িতে আসার ধকল আছে তো। অমলেন্দুও গড়িয়ে পড়েছে এক কথায়। যেন বহুকাল পরে নিজের বিছানাটা পেয়ে ভারি নিশ্চিন্ত।

নন্দিনী নরম রাতবাতি জ্বালিয়ে দিল। পাখাও কমিয়ে দিল একটু। হাওয়া ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, ঝপ করে সর্দিকাশি না ধরে যায়। পাতলা একখানা চাদরও ঢেকে দিল গায়ে, বাবা আরাম পাবে।

সুব্রত সোফায়। টেবিলে পা তুলে সিগারেট খাচ্ছে। নন্দিনী বেরিয়ে উল্টো দিকে বসল,—চা চলবে?

সুব্রত হাত বাড়িয়ে অ্যাশট্রে টেনে নিল কোলে,—ওঁকে কিছু দিলে না?

—বিশ্রাম নিচ্ছে নিক। একটু পরে হরলিক্স দিয়ে দেব।

—চা করলে লিকারটা একটু কড়া করে কোরো। টায়ার্ডনেসটা কাটবে।

ক্লান্তি একটু নন্দিনীরও আসছিল। এ কি শুধুই পথশ্রম? নাকি মনের উপর চাপও পড়ছে একটা? কে জানে, হয়তো সুব্রতরও একই অবস্থা!

সুব্রত যে শেষ পর্যন্ত সঙ্গে যাবে , সকালেও আন্দাজ করতে পারেনি নন্দিনী। সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে গাড়ি ঠিক করে এল, বাজার-হাট সারল, তারপর অফিসের জন্য তৈরি না হয়ে হাসতে লাগল মিটিমিটি। চলো ফাদার-ইন-লকে প্রথমে আমার মুখটাই দেখিয়ে আসি! ওখানেও সুব্রত পাশে পাশে ছিল সারাক্ষণ। কথাবার্তা বলল ডাক্তারের সঙ্গে, কীভাবে কী ওষুধপত্র খাওয়াতে হবে জেনে নিল পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে। এসব কাজে সুব্রতর মাথা বেশ ঠাণ্ডা, পাশে থাকলে অনেক ভরসা পাওয়া যায়।

টেবিলে চা রেখে শোওয়ার ঘর থেকে চিরুনি নিয়ে এল নন্দিনী। ধুলো জমে খুব জট পড়েছে চুলে,কাপে চুমুক দিতে দিতে চেপে চেপে আঁচড়াচ্ছে চুল।

সুব্রত বলল,—একেবারে চান করে নিলে পারতে।

—আজ থাক। কাল তো অফিস যাচ্ছি না, কাল ভালো খরে মাথা ঘষে নেব। বলতে বলতে সুব্রতকে দেখল একটু। ঈষৎ উদ্বেগমাখা স্বরে বলল,— কী বুঝছ? কেমন দেখলে বাবাকে?

—দু তিন ঘণ্টায় কি বোঝা যায়? কটা দিন যাক।

—শরীরটা একটু ফিরেছে না?

—হ্যাঁ। পুজোর পরে যা দেখেছিলাম তার চেয়ে মুখ চোখ অনেক ফ্রেশ। তবে....

—তবে কী?

—একটা জিনিস লক্ষ করেছ? গাড়িতে কিন্তু এবার একটু বেশি চুপচাপ ছিলেন।

—হুম। কথা একটু কমই বলেছে। তবে যেটুকুনি বলছে সেটুকুনি...কোনও অসংলগ্ন ব্যাপার নেই।

—আগের বার উচ্ছ্বাসটা একটু বেশি ছিল।

—এটা তো গুড সাইন, কি বলো?

—হোপ সো।

—তাহলেও এবার আয়ার উপর আমি পুরোটা ছাড়ব না। যতক্ষণ বেশি পারি বাবাকে কম্পানি দেব।

—ঠিক। সঙ্গ দেওয়াটা খুব জরুরি। লোনলিনেসের ফিলিংটা যেন আদৌ না ডেভেলাপ করে। পারলে টানা কিছুদিন ছুটি নিয়ে নাও।

নন্দিনীরও সেইরকম মনোগত ইচ্ছে। তবে একদম একটানা নয়. দুদিন পাঁচদিন করে মাঝে মাঝেই ডুব মারবে। ছ মাসের মতো আর্নড লিভ তো জমাই আছে, পচে যাচ্ছে। ভেঙে ভেঙে নিলে বরং ওই ছুটিতেই বছর দুয়েক চালিয়ে দেওয়া যায়। বড় জোর রথীনবাবুর মুখ ভারি হবে একটু। হোক্ গে, নন্দিনীর তাতে বয়েই গেল। বাবা আগে? না অফিস আগে? বাবা যেন আর কখনো মনে না করে মেয়ে তার পর হয়ে গেছে।

সুব্রত আবার সিগারেট ধরিয়েছে। উঠে পড়ল। স্নানে যাবে। নন্দিনী রান্নাঘরে গেল, হরলিক্স বানিয়ে খাইয়ে এল অমলেন্দুকে, ভাতও বসিয়ে দিয়েছে।

দই মাছ করেই রেখে গেছিল, ফ্রিজ থেকে মুরগি বার করে স্টু'ও বানাল অল্প করে, আলু ভাজল। কাজের ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দিয়ে দেখে আসছে বাবাকে। একবার দেখল বড় আলো জ্বালিয়ে খবরের কাগজ পড়ছে অমলেন্দু, আর একবার দেখল স্যুটকেস থেকে নিজের জামাকাপড় বার করে গুছিয়ে তুলছে আলনা ওয়ার্ড্রোবে। ঘর থেকে বেরিয়ে টিভিও দেখল একটুক্ষণ।

নন্দিনী নিশ্চিন্ত বোধ করল। এ সব তো সুস্থতারই লক্ষণ।

রাতে খাওয়া দাওয়ার পর অমলেন্দু বিছানায় গেল না। বসেছে গিয়ে বারান্দায়। বাড়িটা অনেক পুরানো দিনের বটে, পাড়াটাও ঘিঞ্জি, তবে দোতলার এই ঝুলবারান্দার একটা আলাদা আকর্ষণ আছে। অনেকখানি চওড়া, স্যান্ডকাস্টিং করা রেলিং, মাথার ওপরটা খোলা। রেলিং-এ দাঁড়ালে অনেক দূর অবধি রাস্তা দেখা যায়। ছোটবেলায় এই বারান্দায় নন্দিনীর বহু একলা মুহূর্ত কেটেছে। হয়তো বা অমলেন্দুরও।

এখন বারান্দায় বেতের চেয়ার পাতা থাকে বারো মাস। দু চারটে ফুলের টবও আছে। সুব্রতর শখ।

নন্দিনী হাতের কাজ সেরে বারান্দায় এল। মেঘ কেটে গেছে পুরোপুরি, ঝকঝকে আকাশ, দু চারটে তারাও যেন দেখা যায়। গুমোট ভাবটা ফিরছে আবার, তবে শীতলতার একটা রেশ এখনও রয়ে গেছে।

নন্দিনী হাই তুলল,–কী গো, রাত হয়েছে তো, শুতে যাবে না?

–এই যাই।

–তোমার এখন কটা ওষুধ আছে?

–এখন তো একটাই। ঘুমের ট্যাবলেট।

নন্দিনী হাসল। যাক্, এটাও খেয়াল আছে। বলল,–এনে দেব?

–আমি নিয়ে নেব। আমার অভ্যেস হয়ে গেছে। বলতে বলতে জোরে শ্বাস টানছে অমলেন্দু, –মিষ্টি একটা গন্ধ বেরোচ্ছে না? চেনা চেনা?

–টবে বেল ফুল ফুটেছে। ওই তো, দ্যাখো।.. গাছ ভর্তি ফুল।

ঘাড় ঘুরিয়ে কোণে রাখা টবটাকে দেখল অমলেন্দু। তারপর হঠাৎই অস্ফুটে বলে উঠেছে,–রমলা বেলফুলের গন্ধ খুব ভালোবাসত।

–কে? কে ভালোবাসত?

–রমলা। তোর মা।

নন্দিনী বিস্মিত। বাবার মুখে মার নাম? জ্ঞান হওয়া অবধি ভুলেও কখনও শুনেছে কি? মনে পড়ে না।

মনে করার ইচ্ছেও নেই নন্দিনীর। মা তার হৃদয়ের গোপন কন্দরে লুকিয়ে থাকা এক ক্ষতস্থান, এখানে দৈবাৎ হাত পড়ে গেলে কী যে বিশ্রী জ্বালা।

অমলেন্দু চেয়ার ছেড়ে বারান্দার প্রান্তে গেল। ঝুঁকে একবার ফুলগাছটাকে দেখে নিয়ে রেলিঙে হাত বোলাচ্ছে। স্বাভাবিক স্বরেই বলল,–এ তো একেবারে ঝুরঝুরে হয়ে গেছে রে।

নন্দিনীর ঠিক যেন কানে গেল না কথাটা। জিজ্ঞেস করল,–কী হয়েছে?

–বাড়িটা তো এবার একটু সারানো দরকার। রেলিং খসে পড়ছে, দেওয়ালের চটলা উঠে যাচ্ছে...অনেকদিন তো কলিও ফেরানো হয়নি।

নন্দিনী মনে মনে বলল,তুমি সে সুযোগ আমাদের দিলে কই! ভেবেছিলাম বিয়ের পর কিছু একটা করব....

অমলেন্দু ফের বলল,–সিংহিবাবুর কোন ছেলে ভাড়া নিতে আসছে?

–ওদের তো এখন ভায়ে ভায়ে জোর গণ্ডগোল। প্রত্যেকেই শাসাচ্ছে তাকে ছাড়া যেন অন্য ভাইকে ভাড়া না দিই।... আমি তো এক বছর ধরে রেন্ট কন্ট্রোলেই জমা দিচ্ছি। সুব্রত বলল, ওটাই সেফ্, কোনও শরিকই ট্যাঁ ফোঁ করতে পারবে না। ঠিক করছি না?

–ওরকম হলে আর উপায় কী? অমলেন্দু মাথা দোলালো। একটুখানি ভেবে বলল,–হ্যাঁ রে খুকু, আমায় দিয়ে একবার যে ভলান্টারি রিটায়ারমেন্টের কাগজপত্র সই করিয়ে নিয়েছিলি তার কী হল?

নন্দিনী চমকিত,–তোমার মনে আছে?

–থাকবে না কেন? তুই অ্যাপ্লিকেশন টাইপ করিয়ে আনলি, আমি সই করে দিলাম...

–ও আমি জমা করে দিয়েছি বাবা। তবে ওদিক থেকে এখনও কোনও সাড়াশব্দ নেই।

–পি এফ, গ্র্যাচুয়িটি কিচ্ছু রেডি হয়নি?

–একবার খোঁজ করেছিলাম। মাস আষ্টেক আগে। তখনও বলেছিল হয়নি।

–আবার তাড়া দে।... থাক ছেড়ে দে, আমি নিজেই যাব। থোক টাকা কিছু হাতে এলেই মিস্ত্রি লাগিয়ে দেব বাড়িতে। আমাদের থাকতে যখন হবে ...বাড়িওয়ালারা করবে না...! আমি মরে গেলেও তো তোদের এ বাড়ি ছাড়ার কোনও মানে হয় না। এত কম ভাড়ায় এরকম একখানা বাড়ি.. এত সুন্দর লোকেশান...দু পা হাঁটলে ট্রামরাস্তা, হাতিবাগান বাজার..

এ তো সম্পূর্ণ সুস্থ সংসারী মানুষের কথা! নন্দিনীর মুখে কথা ফুটছিল

না। ভেতরটা আনন্দে টইটম্বুর সহসা। বাবা এরকম থাকলে নন্দিনীর আর চিন্তা কিসের!

বিহ্বল নন্দিনী আবেগে জড়িয়ে ধরেছে বাবাকে। বহুকাল পরে গদগদ স্বরে ডাকল, –বাবা!

অমলেন্দু হাসছে মৃদু মৃদু। হাত রাখল মেয়ের মাথায়,–কী রে?

নন্দিনী দু দিকে মাথা নাড়ল। আলগোছে চোখের কোলটা মুছে নিয়ে বলল, – কিছু না বাবা। শোবে চলো।

পাঁচ

অমলেন্দু খুব ভোরে উঠে পড়ে আজকাল। বিছানায় বসে কী সব জপতপ করে খানিকক্ষণ। উন্মাদ আশ্রমেই কার কাছে নাকি শিখেছে, এতে তার মন ভালো থাকে। তারপর একটু হাঁটতে বেরোয়। একাই। বেশি দূর নয়, ওই হেদো পর্যন্ত। বার তিনেক জলাশয়টাকে চক্কর মারে, পার্কের বেঞ্চিতে জিরোয় সামান্য, বাড়ি ফিরে নন্দিনীদের সঙ্গে বসে চা টা খায়, খবরের কাগজ পড়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে, টিভি দেখে। দুপুরে ঘুম, বিকেলে আবার একটু হাঁটা, নয়তো ঝুলবারান্দায় চুপচাপ বসে থাকা। নিখুঁত এক অবসরপ্রাপ্ত মানুষের জীবন।

প্রথম প্রথম ভোরবেলা বাবাকে একা ছাড়তে ভারি আপত্তি ছিল নন্দিনীর। দুচারদিন সঙ্গও দিয়েছিল। ফিরেই অফিসের তাড়া থাকে, সুব্রত সাড়ে নটার মধ্যে বেরিয়ে যায়, তার জন্য রাঁধাবাড়া থাকে, তবুও। লম্বা লম্বা পায়ে হাঁটে অমলেন্দু, আটান্ন বছরের টান টান শরীর মানুষটার সঙ্গে নন্দিনী পেরে ওঠে না, হাঁপিয়ে যায়। রাস্তায় বেরিয়ে অমলেন্দু কথাও বলে না একদম, উদাসী সন্ন্যাসীর মতো মাথা উঁচু করে এক মনে হাঁটে, নন্দিনী বকবক করার চেষ্টা করলেও আমল দেয় না বড় একটা–একটা মানুষের পিছনে কাঁহাতক আর ঘুরে মরা যায়!

একদিন বলেই ফেলল,–তোমার সঙ্গে আমি না থাকলে অসুবিধে হবে?

– না তো। অসুবিধে কিসের?

–একা একাই যাবে তুমি?

–একাই তো আমার ভালো লাগে। তোর রোজ রোজ বেরোনর দরকারটাই বা কী? সকালে এত কাজকর্ম থাকে...! অমলেন্দু বিমল হেসেছিল,–ভয় পাস না খুকু, আমি একদম ঠিক আছি।

অমলেন্দু যে সত্যিই ভালো হয়ে গেছে, আচার আচরণই তো তার প্রমাণ। তবু নন্দিনীর সংশয় যায় না। ছুটি নিয়ে বসে থাকছে মাঝে মাঝেই। অফিস

গেলে ফোন করছে বারবার। ডিটেকটিভের মতো খবর নিচ্ছে আয়ার কাছে।... কী বললে? ঘুমোচ্ছে? শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ল?.....দুপুরের ওষুধগুলো পড়েছে ঠিক মতো?...রেডিও শুনছিল্? গান? বাহ্, ...টানা বেশিক্ষণ টিভি দেখতে দিও না, বাবার স্ট্রেন হবে...আমি কখন ফিরব জিজ্ঞেস করছে? করছে না? ও।.....

নাহ্, নন্দিনী বাড়ি রইল কি না রইল, পাশে বসে আছে কি নেই, কিংবা তার ফিরতে দেরি হল, এসব নিয়ে অমলেন্দুর আর বিন্দুমাত্র মাথাব্যাথা নেই। রাতেও নন্দিনী বাবার পাশে গিয়ে বসে থাকে কিছুক্ষণ, লক্ষ করে বাবা তাকে কাছে চাইছে কিনা। নন্দিনীর উপস্থিতিটা যেন গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না অমলেন্দু, মশারিটাও নিজে নিজে টাঙিয়ে নেয়। এখন সে যেন একটু বেশিই স্বাবলম্বী হয়ে পড়েছে, তুচ্ছ প্রয়োজনে সে আর মেয়ের ওপর নির্ভরশীল হতে আগ্রহী নয়।

এসব লক্ষণ দেখে নন্দিনীর তো খুশি হওয়ারই কথা। কিন্তু আশ্চর্য মানুষের মন, খুশিটা নন্দিনী ঠিক যেন উপভোগ করতে পারে না। বুকের গভীরে কোথায় যেন একটা ছোট্ট কাঁটা খচখচ করতে থাকে। একসময়ে অমলেন্দু তাকে চোখে হারাত, নন্দিনীর মনে হতো বাবা তাকে অক্টোপাসের মতো পিষে ধরছে,তার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে, একটুখানি মুক্তি পাওয়ার জন্য ছটফট করে মরত নন্দিনী। অফিস সুব্রত প্রেম সবই ছিল তার মুক্তির বাতায়ন,বাইরের জগতের টাটকা বাতাস। আজ যেন পাশার দান উল্টে গেছে। সে যে বাবার পাশে আছে, প্রতি মুহূর্তে বাবাকে নিয়ে চিন্তা করছে, সেটুকুও যেন খেয়াল করে না বাবা। এত নির্লিপ্ততাও কি সহ্য হয়?

এ এক অদ্ভুত অনস্তিত্বের সংকট। নিজের মতো করে একটা ভুবন গড়ে নিয়েছে অমলেন্দু, সেখানে আর এখন মেয়ে নেই, নন্দিনী উপলব্ধি করতে পারে।

কথাটা একদিন ডাক্তারবাবুকে বলেও ফেলল নন্দিনী। প্রতি মাসেই ডক্টর করকে একবার করে রিপোর্ট দিতে যায়, সেদিন অনুযোগের সুরেই তুলল প্রসঙ্গটা,–কেমন ড্রাগ দিয়েছেন ডাক্তারবাবু, বাবার তো আমার উপর থেকে টানটাই চলে গেছে? গত সপ্তাহে আমার জ্বর হয়েছে শুনল, তাও একবার গায়ে হাত দিয়ে দেখল না পর্যন্ত! এটা কি নরমাল? জানেন, আগে এমনটা হলে পাড়ার বোসডাক্তারকে বাবা চেম্বার থেকে হিড়হিড় করে টেনে আনত।

ডক্টর কর ভুরু কুঁচকে ভাবলেন একটু। তারপর বললেন,–এটা এমন কিছু অস্বাভাবিক ব্যবহার নয়। উনি আগে যে আচরণটা করতেন, সেটাই ছিল বরং

ওঁর অবসেশান। বাড়তে বাড়তে ওটাই পাগলামির পর্যায়ে পৌঁছেছিল। এনি ওয়ে, অন্য কিছু ইরেগুলারিটি আছে বলে মনে হয়?

–না... সেভাবে...মানে....

–খিদে টিদে হচ্ছে ঠিক মতো?

–হ্যাঁ।

–মনমরা হয়ে বসে থাকেন? ব্রুড করেন?

–না। টিভি দেখছে,রেডিও শুনছে, বই পড়ছে....

–ভেরি গুড। উনি আবার অ্যাক্টিভ হ্যাবিট্‌সে ফিরে এসেছেন।....একা একা কখনও বিড়বিড় করেন তো?

–না না। আমি অন্তত দেখিনি।

–ঘুম হচ্ছে?

–তা হচ্ছে। বড় জোর রাত্রে একবার ওঠে বোধহয়।

–আপনার হাজব্যান্ডের সঙ্গে ওঁর সম্পর্ক কেমন?

–ভালো। দুজনে এক সঙ্গে বসে টিভিতে ক্রিকেট ফুটবল দেখে, সুব্রত অফিসের কোনও গল্প করলে মন দিয়ে শোনে।....ও হ্যাঁ, একদিন সুব্রতর সঙ্গে বেরিয়েওছিল। লাইব্রেরিতে, মানে বাবা যেখানে চাকরি করতো সেখানে গিয়েছিল দুজনে।

–হঠাৎ?

–ওই ভি আর-এর ব্যাপারটা নিয়ে...। একাই যেতে চেয়েছিল, আমিই জোর করে সুব্রতকে পাঠালাম। ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুর ছিল,ভাবলাম ওই প্রচণ্ড গরমে যদি শরীর খারাপ হয়ে যায়...

–ভালোই করেছেন। একা একা খুব বেশি দূর ছাড়াও এখন উচিত হবে না। অতগুলো নার্ভের ওষুধ চলছে...।

–আমি তো মোটেই ছাড়তে চাই না। সকাল বিকেল হাঁটতে বেরোয়, তাই আমার বুক কাঁপে।

– না না, অ্যালাও করুন অল্পস্বল্প। একেবারে বন্দিদশায় রাখাও তো ঠিক নয়।.. বাই দা বাই, আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে ব্যবহার কেমন?

– ঠিকই আছে।

– তারা এলে গুটিয়ে থাকেন না তো?

– না। কথা কম বলে, তবু বলে। এই তো সেদিন আমার মাসতুতো দিদি বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে ডে-স্পেন্ট করে গেল। দিব্যি তাদের সঙ্গে গল্প করল,

বাচ্চাদের আদর করল....একবাচ্চার জন্মদিনে গেছিল, সেখানেও বেশ জলি ছিল।

–বাহ্ বাহ্। বাচ্চাদের সঙ্গ পেলে এই ধরনের পেশেন্টরা রিফ্রেশড্ হয়। বলেই ডক্টর কর স্থির চোখে দু এক পলক দেখলেন নন্দিনীকে,– কিছু যদি মনে না করেন, একটা পার্সোনাল প্রশ্ন করি? অবশ্য আমার পেশেন্টেরই স্বার্থে।

–বলুন?

–আপনাদের তো প্রায় বছর চারেক হল বিয়ে হয়েছে, এখনও একটাও ইস্যু নেই কেন? প্ল্যান-ট্যান করছেন নাকি?

নন্দিনী বেশ অস্বস্তি বোধ করল। বাচ্চা সে চায় না এমন নয়, কিন্তু তার যে বড্ড ভয় করে। বাচ্চাটাকেও যদি বাবা সহ্য করতে না পারে? যদি নতুন জটিলতা দেখা দেয়? দুর্বল মুহূর্তে সুব্রতকে কথাটা একবার বলেও ফেলেছিল। সহজভাবে কথাটা মেনে নিতে পারে নি সুব্রত। বাচ্চা নিয়ে আর পীড়াপীড়ি করে না বটে, তবে তার মনে এক দলা অভিমানও জমে আছে, নন্দিনী টেরও পায়। গেলেই উৎপলদা বাচ্চা হওয়ার প্রসঙ্গ তোলে, তাই সরমাদির বাড়ি যাওয়া প্রায় ছেড়েই দিয়েছে। গত বছর টাবলুর জন্মদিনে না যাওয়ার কারণ কতকটা তো ওটাই।

ডক্টর কর বুঝি পড়ে ফেলেছেন অন্তরটা। বললেন,–আপনাদের কিন্তু একটা সন্তানের খুব দরকার ম্যাডাম। চাইল্ড ইজ আ ডিপ বন্ডেজ। এই মায়ার বাঁধনে আপনার বাবারও খুব উপকার হবে।

নন্দিনী চুপ হয়ে গেল। উপকার মানে কি? নন্দিনীর কাছ থেকে আরো দূরে সরে যাওয়া? একটা খেলনা পেয়ে ভুলে থাকা?

ডক্টর কর আবার চোখ স্থির করে দেখছেন। মুখ হাসি হাসি করে বললেন –মাথা থেকে সব দুশ্চিন্তা মুছে ফেলুন। ওঁকে পাঁচজনের সঙ্গে মিশতে দিন, একটা নতুন লাইফ দেওয়ার চেষ্টা করুন। তবে হ্যাঁ, ডিপ মেলাঙ্কলিয়ার পেশেন্ট তো, কখনোই এরা হানড্রেড পারসেন্ট কিওর হন না। ওই ওষুধ দিয়ে যতটুকু, প্লাস পরিবেশ যতটা সম্ভব চিয়ারফুল রেখে...। শুধু মাথায় রাখবেন, কোনও ধরনের স্নায়বিক উত্তেজনার কারণ যেন না ঘটে। আই রিপিট, কোনও রকম এক্সাইটমেন্ট চলবে না।

–মনে থাকবে ডাক্তার বাবু। আমি খুব অ্যালার্ট আছি।

–দ্যাটস ফাইন। পারলে কদিন ওঁকে নিয়ে আপনারা স্বামী-স্ত্রী কোথাও ঘুরে আসুন না। হাওয়া বদল হবে, আপনারাও ফ্রেশ হবেন, ওঁরও ভালো লাগবে..

খুঁতখুঁতুনিটা তবু রয়েই গেল নন্দিনীর। বুঝি বা একটু বিষণ্নতাও। নিজেকেই নিজে পড়তে পারছে না। বাবা আগের মতো সর্বক্ষণ খুকু খুকু করলেই কি তার বেশী ভালো লাগত? উঁহু,তাও তো নয়। তাহলে তো আশঙ্কটা থেকে যেত। নন্দিনী যে এখন ঠিক কী চায়?

রাত্রে খেতে বসে বেড়ানোর কথাটা পাড়ল নন্দিনী। শুনেই সুব্রত এক পায়ে খাড়া,– যা গরম পড়েছে, চলো দার্জিলিং ঘুরে আসি।

অমলেন্দু ভাত মাখছিল। শুনল চুপ করে, কোনও মন্তব্য করল না।

নন্দিনী বলল,– কী বাবা,যাবে তো? কদিন বেশ হৈহৈ করা যাবে।

–পুরীও যেতে পারিস।

–পুরী ? এই গরমে?

–আমার খুব পুরী যেতে ইচ্ছে করে। সেই তোর মা আর আমি গিয়েছিলাম... কতকাল আগে...

সুব্রত নন্দিনী মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। ইদানিং অমলেন্দু মাঝে মাঝেই রমলার কথা বলছে। হঠাৎই হঠাৎই। নন্দিনীর পলকের জন্য মনে হল কথাটা তো ডাক্তারবাবুকে বলা হয়নি। পরক্ষণেই মনে হল, বললেই বা কী লাভ হত? ডাক্তারবাবু হয়তো বলতেন, এটাও তো শুভ লক্ষণ! পঁচিশ বছর ধরে একবারও স্ত্রীর নাম উচ্চারণ না করাটাই কি অস্বাভাবিকতা নয়?

সুব্রত বলে উঠল,– বেশ তাই হোক। তবে পুরীই চলুন।

নন্দিনী তীব্র চোখে বাবাকে দেখল। তাকিয়েই আছে।

অমলেন্দুর ভ্রুক্ষেপই নেই। নিবিষ্ট মনে খাচ্ছে।

ছয়

এ বছর কলকাতায় বর্ষা এসেছিল বেশ দেরিতে। কিন্তু সেই যে এল, আর নড়ার নামটি নেই। ভাদ্র মাস পড়ে গেছে, এখনও আকাশের মুখ হাঁড়ি। সকাল নেই, বিকাল নেই, দুপুর নেই, রাত্তির নেই, ঝুমঝুম ঝরঝর ঝিরঝির। সূর্যদেব যেন কলাবউটি সেজেছেন, তেজ টেজ হারিয়ে মুখে ঘোমটা টেনে লুকিয়ে আছেন অন্দরমহলে। লোকজন অতিষ্ঠ, কত আর ছাই ছাই আকাশ দেখতে ভালো লাগে!

তবে বর্ষাই নন্দিনীর প্রিয় ঋতু। রোদ্দুর না উঠলেই সে খুশি। বৃষ্টিতে ভিজতে তার মোটেই খারাপ লাগে না। গত মাসে পুরী গিয়েও দু দিন বৃষ্টি পেয়েছিল। সমুদ্রের পাড়ে দাঁড়িয়ে প্রাণের সুখে সিক্ত হয়েছে সে।

আজও দুপুর থেকে ঝরছে ঝিরঝির। অফিস থেকে বেরিয়ে বাড়ি ফিরতে

ফিরতে দিনটা কখন ঘন আঁধার। বাস থেকে নেমে ছাতা খুলল না নন্দিনী, জলকণা গায়ে মেখে হাঁটছে। মোড়ের দোকান থেকে মুড়ি তেলেভাজা কিনে নিল। বাদলা দিনে দারুণ জমবে।

সুব্রত আজ অফিস যায়নি। কাল রাত থেকে গা ছ্যাঁক ছ্যাঁক, ডুব মেরেছে। সোফায় আধশোওয়া হয়ে টিভিতে বক্সিং দেখছিল সুব্রত, ঠোঙাগুলো টেবিলে রেখে নন্দিনী জিজ্ঞেস করল, – কমলার মা কোথায়? চলে গেছে?

– এই তো গেল। রুটি সেঁকে দিয়ে।

অমলেন্দু ভালো আছে বলে আয়া ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে গত মাস থেকে। কমলার মা'ই এখন সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত থাকে। অমলেন্দুকে পুরোপুরি একা ছেড়ে যেতে এখনও সাহস পায় না নন্দিনী।

বাথরুমে গিয়ে নন্দিনী চুল মুছে এল, শাড়ি জামাও বদলে ফেলল ঝটপট। সুব্রতর সামনে বসে কাঁসিতে মুড়ি মাখছে, – তোমার শরীর এখন কেমন?

– ও, ফাইন। সর্দিটা দারুণ এনজয় করছি।

– সব সময়ে ফাজলামি। ওষুধ খেয়েছ?

– ইয়েস ম্যাডাম।

– বাবা কী করছে?

– শুয়ে আছেন ঘরে।

– এখন শুয়ে?

– তাই তো দেখছি। দুপুর থেকেই ঘরে রয়েছেন। ডাকলাম একবার, বললেন ওঁরও নাকি গা ম্যাজম্যাজ। দুপুরে জোর রেডিও চালিয়ে নাটক শুনছিলেন। পুরনো দিনের কী একটা প্লে হচ্ছিল। বোধহয় প্রফুল্ল টফুল্ল। খুব কান্নাকাটির আওয়াজ আসছিল।

– উহুঁ, এতক্ষণ শুয়ে থাকা কোনও কাজের কথা নয়। শ্বশুর জামাই দুজনেই ভোগাবে দেখছি।

খানিকটা মুড়ি তেলেভাজা সুব্রতকে ধরিয়ে দিয়ে কাঁসি হাতে বাবার ঘরে এল নন্দিনী। খটাস করে আলো জ্বালিয়েছে।

এ ঘরে পা রাখলে আজকাল আর পুরনো রিনরিনে আবেগটা আসে না, বরং যেন চোরা বিষাদটাই ডানা মেলতে চায়। মাত্র ক'মাসেই আরও বেশি মলিন লাগে ঘরটাকে। জীর্ণ দেওয়ালে অজস্র ছোপ, উঁচু সিলিং যেন দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। সাবেকি খাটখানাও ডুবছে অবসন্নতার ভারে। টেবিলটাও বেশ অগোছালো। এক গাদা বই, কাগজ, ওষুধের স্ট্রিপ, ক্যাশমেমো, সব এলোমেলো

ছড়ানো। গুছোন যায় না, অমলেন্দু হাত দিতে বারণ করে। তার নাকি দরকারি জিনিস খুঁজে পেতে অসুবিধা হয়। টেবিলের মধ্যিখানে রমলার কবেকার এক ফটো। গায়ে জ্বালা ধরানো ছবি। রূপসী রমলা হাসছে। পুরী থেকে ফিরেই কোত্থেকে কোন ট্রাংক ঘেটে বার করেছে অমলেন্দু। নন্দিনী আপত্তি জুড়েছিল, সুব্রতই থামিয়েছে। নন্দিনীকে আলাদা করে বুঝিয়েছে, উনি তো অশান্তি করছেন না কোনও। যে ভাবে ভালো থাকেন, থাকুন না।

নন্দিনীর যে কোথায় বাজে সুব্রত কী বুঝবে? ঐ ছবি তো নন্দিনীরই প্রতিবিম্ব!

অমলেন্দু হাতে চোখ ঢেকে শুয়েছিল। সহসা আলোর বিস্ফোরণে সে একটু বিরক্তই হয়েছে। বলল,–আহ্, নেবা না বাতিটা।

নন্দিনী ছবিটা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিল। এই মানুষটার ওপর অভিমান পুষে রেখেই বা কী লাভ? যে কিছু বোঝে না...

অকারণে নন্দিনী তারল্য আনল গলায়, – উঁহু, নেবাব না। গা ম্যাজম্যাজ করলে বেশি শুয়ে থাকতে নেই। ওঠো, গরমাগরম পেঁয়াজি খাও।

অমলেন্দু উঠে বসল বটে, তবে কেমন অন্যমনস্ক। বলল,– ফিরলি কখন?

– অনেকক্ষণ। দেখছিলাম তুমি তেলেভাজার গন্ধ পাও কিনা। কাঁসিখানা বাবার দিকে বাড়িয়ে দিল নন্দিনী। খাটের কোণে বসল, – মুখটা অমন ভার ভার কেন?

অমলেন্দু উত্তর দিল না। এক মুঠো মুড়ি তুলেছে, খাচ্ছে না, হাতেই ধরে আছে।

– কী ভাবছ?

জবাব নেই।

এ রকম হয় মাঝে মাঝে। একটু গোমড়া হয়ে থাকে অমলেন্দু। কিছুক্ষণ কথা বললে স্বাভাবিক হয় ধীরে ধীরে।

নন্দিনী বলল, –এবার একদিন রাজমিস্ত্রির সঙ্গে বসতে হবে। এস্টিমেট নিতে হবে একটা। বর্ষা গেলেই রিপেয়ারিং-এর কাজে হাত দেব।

অমলেন্দু যেন শুনতেই পেল না।

নন্দিনী ফের বলল,– তুমি টাকাপয়সা এখনও পাওনি বলে ভাবছ ? আমরা তো আছি...

দুম করে অমলেন্দু বলে উঠেছে – আজকের দিনটা তোর মনেই নেই, না রে খুকু?

– কী আছে আজ? নন্দিনী স্মৃতি হাতড়াল।

– আজ তার মৃত্যুদিন।

– কার?

– রমলার।

মুহূর্তে নন্দিনী হাজার ভোল্টের শক খেয়েছে। বাবার এটাও মনে আছে নাকি? মনে ছিল? এত দিন ধরে?

অমলেন্দু একটা বড়সড় শ্বাস ফেলল, – রমলা বড় যন্ত্রণা পেয়ে মরেছিল।

দুম করে মাথা গরম হয়ে গেল নন্দিনীর। শুকনো গলায় বলে ফেলেছে, যন্ত্রণা তার পাওনা ছিল বাবা। সেও আপনজনকে কম কষ্ট দেয়নি।

– ও কথা বলিস না রে খুকু। সে ভারি দুঃখী ছিল, তুই সবটা জানিস না।

– আমি সব জানি। শুধু আমি কেন, দুনিয়ার সব্বাই জানে। নন্দিনীর মুখ বিদ্রুপে বেঁকে গেল, –দুঃখ! রূপ বেচে যে নাম কিনতে চায় তার কপালে আর কী জুটবে?

– চুপ চুপ, একদম চুপ। অমলেন্দুর গলা হঠাৎ চড়ে গেছে, – তুই কিছু জানিস না। ওই রূপের জন্য তাকে কত অপমান সইতে হয়েছে...!

– অপমানবোধ ছিল তার? সে তো ওভাবেই বাঁচতে চেয়েছিল। অমলেন্দুর ভেতরে পঁচিশ বছর পর জেগে ওঠা আবেগটাকে থেঁতো করে দিতে চাইল নন্দিনী। রূঢ় স্বরে বলল,–মা মোটেই ভালো ছিল না বাবা। তার কথা আমার সামনে বোলো না। আমার ভাল্লাগে না।

– কেউ তাকে চিনবে না? তুইও না? অমলেন্দুর স্বর কেমন হাহাকারের মতো শোনাল, – জীবনে তো একটাই চাওয়া ছিল তার। অভিনয়ে নাম করা। কী পেয়েছে? ছোট্ট একটা পার্টের টোপ দিয়ে তাকে সবাই শেয়াল কুকুরের মতো ছিঁড়ত। সব জানতাম আমি, সব বুঝতাম। আমার কাছে এসেই তো সব বলত প্রথম প্রথম, আর হাউ হাউ করে কাঁদত। আমি কোনওদিন এক বারের জন্যও তার পাশে দাঁড়াইনি।

অমলেন্দু রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। শ্বাস নিচ্ছে জোরে জোরে। হাপরের মতো ওঠা নামা করছে তার বুক।

নন্দিনী সম্বিতে ফিরল এতক্ষণে। এ কী করছে সে? বাবার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সে'ও উত্তেজিত হয়ে পড়ল?

অমলেন্দুর হাত চেপে ধরল নন্দিনী। মিনতির সুরে বলল, – থাক, ও সব কথা। শান্ত হও। ও সব তো কবেই চুকে বুকে গেছে।

– চোকেনি, চোকেনি। অমলেন্দু মাথা দোলাচ্ছে, – ও আমায় এখনও তাড়া করে বেড়াচ্ছে। আমার পিছু ছাড়ছে না..... জানিস, আজও এসেছিল।

নন্দিনীর গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। স্বর ফুটছে না। শঙ্কিত চোখে দেখছে বাবাকে।

অমলেন্দু ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল, – ওর সেই নাটকটা শুনিয়ে গেল আজ। ওর মৃত্যুদিনেই রেডিওতে নাটকটা হল, এ কি কাকতালীয়? বল্ বল্, তুইই বল্?

নন্দিনী আর্তনাদ করে উঠল, – সুব্রত, শিগগিরই এসো। বাবা কেমন করছে!

– কে সুব্রত? সে আমার কী করবে? অমলেন্দুর চোখ যেন ঠেলে বেরিয়ে এল। দু হাতে খামচে ধরেছে নন্দিনীর কাঁধ। অস্থির ভাবে মাথা ঝাঁকাচ্ছে, -- খুব তেজ বেড়েছে তোমার, না? মেয়ে নিয়ে চলে যাবে? আমায় ফেলে? আমি যে এত ভালোবাসলাম তার কোনও মূল্য নেই, অ্যাঁ? আমি সব মেনে নিয়েছি বলে কি আমি নপুংসক? হিজড়ে?

নন্দিনী চেষ্টা করেও নিজেকে ছাড়াতে পারল না। সুব্রত ছুটে এসেছে দরজায়, সেও হতভম্ব মুখে দাঁড়িয়ে।

এক্কেবারে বদলে গেছে অমলেন্দু। ঠিক যেন এক হিংস্র দানব। জান্তব স্বরে গর্জে উঠল, – আজ আর তোমায় আমি বিষ দিয়ে মারব না। আজ তোমার গলা মুচড়ে দেব। আমাকে ফাঁকি দেওয়া, অ্যাঁ?

সুব্রত এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল অমলেন্দুর ওপর। অমলেন্দুর আটান্ন বছরের শরীরে যেন মত্ত হস্তীর বল, সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেও সুব্রত তাকে ঠেলে সরাতে পারছে না। মরিয়া হয়ে হাত চালাল। অমলেন্দুকে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করে মুক্ত করছে নন্দিনীকে।

বিছানায় ছিটকে পড়ে গেল অমলেন্দু। গোঁ গোঁ শব্দ করছে।

নন্দিনীকে এক ঝটকায় ঘরের বাইরে নিয়ে এসে দরজা বন্ধ করে দিল সুব্রত।

নন্দিনী আঁকড়ে ধরল সুব্রতকে। ডুকরে উঠেছে, – মা... মা... ও মা, মা গো...!

সাত

আবার মানকুণ্ডু। আবার সেই উন্মাদ আশ্রম।

একটু আগে অন্দরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে অমলেন্দুকে। একটুও বাধা

দেয়নি অমলেন্দু, ক্ষমতাই ছিল না। ইন্‌জেকশানের প্রভাবে সে এখন আধা অচেতন।

গেটের সামনে দাঁড়িয়ে ডক্টর করের সঙ্গে কথা বলছিল সুব্রত। পাশেই নন্দিনী। মাত্র এক রাতেই তার বয়স যেন বেড়ে গেছে, কেউ যেন কালি মেড়ে দিয়েছে তার মুখে।

ডক্টর কর দু হাত উল্টে বললেন, – স্যাড। ভেরি স্যাড। পুওর সোল।

সুব্রত অপরাধী অপরাধী মুখে বলল, – আমরা কল্পনাও করতে পারিনি আবার রিল্যাপস্ করবে। পঁচিশ বছর আগে মারা যাওয়া স্ত্রীই যে এবার অবসেশানে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, দিস ওয়াজ বিওন্ড আওয়ার ইমাজিনেশান।

– ভুল করছেন। অবসেশানটা ওঁর ভেতরে পঁচিশ বছর ধরেই ছিল। অন্য ফর্মে। মেয়ের ওপর ওঁর পজেসিভনেসটা আদতে একটা ফিক্সেশান। যাঁর সেন্টারে আছেন ওঁর স্ত্রী। উনি অসম্ভব ভালোবাসতেন স্ত্রীকে। প্রেম থেকেই সন্দেহ, ঈর্ষা, এবং সম্ভবত তারই পরিণতি স্ত্রীর মৃত্যু। অবশ্য আমি এখনও শিওর নই উনিই স্ত্রীকে বিষ খাইয়েছিলেন কি না। এটাও ওঁর অবসেশান হতে পারে। হয়তো স্ত্রী সত্যি সত্যিই আত্মহত্যা করেছিল। কিন্তু নিজেকে উনি গিল্টিই ভাবতেন। সেই অপরাধবোধ থেকেই উনি মেয়েকে...। নন্দিনীদেবী ছিলেন ওঁর কাছে ওঁর স্ত্রীরই প্রতীক। যে শেল্টারটা উনি স্ত্রীকে দেননি, মেয়ের মধ্যে দিয়ে স্ত্রীকেই তা ফিরিয়ে দিতে চেয়েছেন। এবং সেই কারণে মেয়েই হয়ে উঠেছিল ওঁর বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন। আমি চেষ্টা করে সেকেন্ডারি অবসেশান, অর্থাৎ মেয়ের পোরশানটাকে অফ্ করে দিতে পেরেছিলাম। কিন্তু অসুখের রুটটা ওঁর মস্তিষ্কে রয়েই গেছে। ওঁর ব্রেন অতি সংগোপনে ফিক্সেশানটাকে লালন করেছে, আমাদের চোখেও ধরা পড়েনি। বহুবার তো কাউন্সেলিং হয়েছে, অটোসাজেশানও ট্রাই করেছি, কিন্তু কখনও ওঁর স্ত্রীর কথা ওঁর মুখে শুনিনি। নেভার। দিস ইজ রিয়েলি আ স্ট্রেঞ্জ কেস। ভালোবাসাটা যে কত ডিপ ছিল ...

সুব্রত মৃদু স্বরে প্রশ্ন করল, – কী মনে হয়? আর কখনও সারবেন?

– ফ্র্যাংকলি স্পিকিং, চান্স খুব রিমোট। তবে আমি আমার যথাসাধ্য করব। কিন্তু দুর্বল স্নায়ু কি এবারের ধাক্কাটা সামলাতে পারবে?

নন্দিনী শুনছিল। আবার শুনছিলও না। তার বুকটা সম্পূর্ণ ফাঁকা হয়ে

গেছে। এতদিন ধরে তাকে আবিষ্ট করে রেখেছিল এক পুরুষ, এখন তার জায়গায় হু হু শূন্যতা।

নন্দিনীই কি তাকে পরিত্যাগ করল? অন্য এক নারী অমলেন্দুর মন প্রাণ জুড়ে ছিল, এই নিষ্ঠুর সত্যিটা কি নন্দিনী সহ্য করতে পারল না? সেই নারী তার মা, তবুও?

আকাশে আজ মেঘ নেই। মেঘ নন্দিনীর মনে। কান্না পাচ্ছিল নন্দিনীর, নিজেকে প্রতারিত মনে হচ্ছিল।

ভেজা চোখে নির্মেঘ আকাশটাকে দেখছিল নন্দিনী।

অর্পিতা

আজকাল দুপুরের দিকে এ সময়টায় বড় ক্লান্তি আসে অর্পিতার। এক বিচিত্র ধরনের অবসন্নতা। অফিসের পরিশ্রমের কারণে নয়, এ যেন একটু অন্যরকম। টিফিন সেরে সিটে ফিরল কি ফিরল না কোত্থেকে দু'চোখ জুড়ে ঘুম ঘুম আর ঘুম। ঠিক ঘুমও নয়, একটা ঝিমুনি ঝিমুনি ভাব। মস্তিষ্ক অবশ হয়ে আসতে থাকে, চতুর্দিক কেমন আবছা আবছা। মনে হয় নেশাগ্রস্ত হয়েছে সে। চোখের পাতা খুলে রাখা তখন কী যে কঠিন!

আজ অর্পিতা একটা ফাইল খুলে বসেছিল। প্রায় জেদ করে। ওই ঝিমঝিম ভাব তাড়াবেই। পারছিল না। দু'মিনিটেই এ জি এমের নোটিশটা আবছা, ক্রমশ অক্ষরগুলোও উধাও। নুয়ে নুয়ে পড়ছে মাথা, চারপাশের গুঞ্জন ক্রমে স্তিমিত হয়ে এল।

সামনে মালবিকা। সিনিয়র টাইপিস্ট। চল্লিশ ছোঁয়নি, এর মধ্যেই যথেষ্ট পৃথুলা, মুখে সর্বক্ষণ জর্দাপান। এখনও মুখ চলছে কচর কচর। অর্পিতার দোদুল্যমান দশা দেখে হাসছে মিটিমিটি।

– কী গো অর্পিতাদি, আজকের দিনেও ঢুলছ?

অর্পিতা ধড়মড়িয়ে সোজা হলো। চোখ থেকে রিডিং গ্লাস নামিয়ে পাতা দুটো রগড়াল একটুক্ষণ। ছোট্ট হাই তুলে বলল,– আর পারি না। বয়স তো হচ্ছে।

– কত হলো? সত্তর? আশি?

– ফাজলামি করিস না। আর মাত্র বারো বছর চাকরি।

– সে তো অনেক দিন। তার মানে আর একটা পে-কমিশানের বেনিফিট নিয়ে যাবে।

অর্পিতা হেসে ফেলল। বয়স যেন পে-কমিশান রিটায়ারমেন্টের হিসেব নিয়ে বাড়ে! ঘুমটাকে পুরোপুরি হঠানোর জন্য মাথা ঝাঁকাল জোরে। বলল,– তোদের হিসেবপত্র সব শেষ হলো ?

– ধ্যুৎ, যে যা খুশি ক্যালকুলেশান করছে। কারুর সঙ্গে কারুর মেলে না। উল্‌টো দিকের চেয়ারে নিজেকে স্থাপন করল মালবিকা, – দীপঙ্করবাবু যোগ-বিয়োগ করে দেখিয়ে দিল সতেরোশো বাড়ছে। দত্তদা পেন চিবিয়ে চিবিয়ে

বলল চোদ্দশো। এদিকে আমার কর্তা আজ সকালে কত কষল জানো? একুশশো। কোনটা ধরি বলো?

– কোনওটাই না। নিজে কাগজ-পেনসিল নিয়ে বসে যা। যেমন সব্বাই করছে।

– ধুস্, ওসব কি আমার দ্বারা হয়? ডি এ মার্জ করো, ইন্টেরিম রিলিফটা ধরো, তারপর এত পারসেন্ট বাড়াও, তার সঙ্গে এতগুলো ইন্‌ক্রিমেন্ট অ্যাড করো...! জানো, আমার ছেলে আমায় কী বলে ? মা, তুমি অঙ্কে কালিদাস!

বিটকেল উপমায় ফের হেসে ফেলল অর্পিতা। হালকা দৃষ্টি চালাল আশপাশে। টিফিনটাইম পার হয়ে গেছে অনেকক্ষণ, তবু এখনও প্রকাণ্ড হলঘরটার বেশির ভাগ চেয়ারই শূন্য। অথচ অফিসেই আছে সব। থোকা থোকা জটলায় ভিড় করে আছে তিন-চারটে টেবিলে।

সকাল থেকেই অফিসের আজ এই চেহারা। কাজকর্ম শিকেয় উঠেছে, চলছে শুধু গুলতানি আর জল্পনা-কল্পনা। আজই সবে খবরের কাগজে স্কেল উল্লেখ করে পে-কমিটির রিপোর্ট বেরিয়েছে, তাইতেই এই সাজো সাজো রব।

ঠোঁটের কোলে পানের কষ। সাপটে মুছে নিল মালবিকা। চোখ টিপল, – তোমার অঙ্ক কী বলছে গো ?

– কী আবার বলবে?

– সিলেকশান গ্রেডে আছ, তোমার তো বেশ মোটাই বাড়বে, তাই না ?

অর্পিতাও নিজের মতো করে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ সেরে রেখেছে। তবু হাত ওলটালো,– কে জানে! হাতে পেলে বুঝব।

– তোমার কোনও গা নেই মনে হচ্ছে ? কত টাকা এরিয়ার হবে জানো? প্রায় ছত্রিশ সাঁইত্রিশ মাস..... হাজার ষাট-পঁয়ষট্টি তো হবেই।

– দিলে তো। স্টেট গভর্নমেন্টের দেখাদেখি আমাদেরটাও যদি পি এফ এ ঢুকিয়ে দেয়!

– ইল্লিরে! কোনও দিন গর্তে ঢোকায়নি, এবার কেন.....? মালবিকার বাক্‌ভঙ্গিতে এখনও এক ধরনের ছেলেমানুষি আছে, আহ্লাদী আহ্লাদী গলায় বলল, – কু গাইছ কেন অর্পিতাদি ? আমি বলে কবে থেকে কত কী ভাঁজছি! কাজের মেয়েটার সপ্তাহে দু'দিন ডুব বাঁধা, প্রথমেই একটা অটোমেটিক ওয়াশিং মেশিন কিনে ফেলব। ফ্রিজটাও বদলে আড়াইশো লিটার করে নেব ভাবছি। হবে কিনা জানি না, আর একটাও ইচ্ছে আছে ....

– কী রে ?

– কর্তা বলছিল তোমার টাকাটা হাতে এলে আমিও অফিস থেকে লোন

নেব। বাড়িটার ভালো করে মেরামতি দরকার। এক ধাক্কায় দেওয়াল-টেওয়ালগুলো প্লাস্টিক পেন্ট করে নিলে.... ওই যে টিভিতে একটা অ্যাড দেখায় না..... পিয়ানো বাজছে, ঘরের রঙ বদলে যাচ্ছে .....

অর্পিতা সংগোপনে ছোট শ্বাস ফেলল একটা। ভারী। উষ্ণ। অন্যের সুখকে হিংসে করে না, তবু কোথায় যেন একটু বেঁধে তো বটেই। এ জীবনে কিছুই কি তার মনোমতো হলো? সেই ভাড়াবাড়ির খাঁচায় বাস, অহরহ টেনশান.... কী করে যে জোড়াতালি দিয়ে সংসারটা চলছে তা অর্পিতাই জানে। মালবিকার মতো বিলাসী স্বপ্ন দেখার সাধ্যই তার নেই। এখনও পর্যন্ত বুবলি-লালটুর পড়াশুনোটা চালাতে পারছে এই না ঢের।

ষাট-সত্তর হাজার টাকা আজকের দিনে কিছুই নয়। তবে টাকাটা হাতে এলে অর্পিতার কিছু সুসার তো হবেই। তারও কয়েকটা পরিকল্পনা আছে। দেখা যাক, কতদূর কী করতে পারে!

পাশের টেবিলে খিলখিল হাসির ঝংকার। পম্পাকে কী যেন বলেছে সুতনু, হাসি থামছে না পম্পার। পে-কমিটির সুপারিশে নতুনরাই সবচেয়ে বেশি লাভবান, তাই তাদের ফুর্তিও বুঝি আজ মাত্রাছাড়া।

মালবিকা চোখ গোল গোল করে তাকাল,– অ্যাই, কী হয়েছে রে? এমন লুটোপুটি খাচ্ছিস কেন?

– সুতনুদা যা একখানা জোক ছাড়ল না...

– কী জোক?

– চেঁচিয়ে বলা যাবে না গো। হিহি। আবার মুখে দোপাট্টা চেপেছে পম্পা।

মালবিকা আর থাকতে পারল না, পড়িমড়ি ছুটল ও টেবিলে।

একঝলক পম্পাদের দেখে নিয়ে চোখ সরিয়ে নিল অর্পিতা। লঘু রঙ্গরসিকতায় তার উৎসাহ কম। অফিসের ওই টাটকা ছেলেমেয়েগুলোর সঙ্গে সে মালবিকার মতো করে মিশতেই পারে না। বয়সের ব্যবধানই কি একমাত্র কারণ? তার যখন কম বয়স ছিল, তখনই বা কবে ওরকম হাহা হিহিতে মেতে উঠতে পেরেছে? এই দুনিয়ায় সব কিছু সবার জন্য নয়।

চশমাটা নিয়ে অর্পিতা নাড়াচাড়া করল একটু। নতুন উদ্যমে ফাইলে মনোনিবেশ করার আগে উঠে পড়ল। লম্বা প্যাসেজ পেরিয়ে এসেছে টয়লেটে। ঘাড়ে মুখে জল থুপল ভালো করে। আঃ, একটু আরাম। আজ বড্ড বেশি গুমোট। আষাঢ় মাস পড়ে গেল, আসি আসি করেও বর্ষার দেখা নেই। যাও বা একটু আধটু ছিড়িক-ছিড়িক ঝরছে, গরম আরও বেড়ে যাচ্ছে হু হু। কদিন ধরে

হাওয়াও একেবারে নিশ্চুপ।

অর্পিতা রুমালে মুখ মুছল, চেপে চেপে। বেসিন থেকে সরে আসছিল, দৃষ্টি আটকেছে আয়নায়। মলিন আলো, অস্বচ্ছ দর্পণ, কাচের অভ্যন্তরে এক মধ্যবয়সী নারী। নির্মেদ চেহারায় দেখায় যেন বয়সের চেয়ে একটু কমই। উপবৃত্তাকার মুখ, দু'ভুরুর মাঝে ছোট্ট লাল টিপ, সিঁথিতে হালকা রক্তিম আভা, নিভাঁজ ত্বক – কাল এখনও তেমন ছাপ ফেলতে পারেনি শরীরে। তবু মনে হয়, কী যেন নেই! কী যেন হারিয়ে গেছে মুখ থেকে! কী যে?

প্যাসেজে ওয়াটার কুলার। টয়লেট থেকে বেরিয়ে অর্পিতা ঢকঢক করে ঠাণ্ডা জল খেল। আলস্য কেটেছে অনেকটা। ধীরপায়ে জায়গায় ফিরছিল, কী ভেবে গেল কমলেশ ব্যানার্জির টেবিলে।

কমলেশ অর্পিতার বহুকালের পুরোন সহকর্মী। বছর দুয়েকের সিনিয়ার। মাঝে কিছুকাল বদলি হয়ে বাইরে ছিল, আবার বছর চারেক হলো ফিরেছে এই ব্রাঞ্চে। কেজো, সংসারী, হিসেবী মানুষ। দরকারে-অদরকারে কমলেশের সঙ্গে টুকিটাকি পরামর্শ করে অর্পিতা।

গাদা খানেক সার্ভিসবুক নিয়ে বসেছে কমলেশ। অর্পিতাকে দেখে মুখে আলগা হাসি,– কী ম্যাডাম, মনে ফুর্তি নেই কেন?

– নেই কী করে বুঝলেন? অর্পিতা চেয়ার টেনে বসল।

– হুম্। আপনাকে দেখে অবশ্য কোনওকালেই কিছু টের পাওয়ার জো নেই। ঈষৎ ভারী চেহারার কমলেশ হেলান দিল চেয়ারে – কী বুঝছেন, অ্যাঁ?

– সিনিয়াররা বোধহয় খুব একটা মার খাব না এবার। মাইনেটা তাও একটু ভদ্র গোছের হবে।

– কচু হবে। চোখেও দেখতে পাবেন না। আট আনা এক টাকার আলু ছয়ে উঠে গেছে, পেঁয়াজ দশের নিচে নামেই না, তেল চল্লিশ, আদা লংকা যখন তখন তিড়িং বিড়িং লাফাচ্ছে.....

– শুধু মানুষের দামই কমছে।

– মোক্ষম বলেছেন। হা হা হা।

অর্পিতাও হাসল। ঠোঁট টিপে। ঝুঁকল সামান্য,– ব্যানার্জিবাবু, এরিয়ারের টাকা তো হাতেই দেবে, তাই না ?

– এখনও পর্যন্ত তো মতিগতি সেরকমই।

–মালবিকা বলছিল, এরিয়ার নাকি ষাট-সত্তর হবে?

– অন্তত পঞ্চাশের বেশি তো বটেই।

অর্পিতা আর একটু ঝুঁকল, – একটা কথা ভাবছিলাম। ..... আপনি তো এসব ব্যাপার বোঝেন-টোঝেন.....। তাই ....

– কী ব্যাপার বলুন তো?

– গত মাসে দিদি-জামাইবাবুর বাড়ি গিয়েছিলাম। বোড়ালে। ওখানে জামাইবাবু একটা জমি দেখাল। আমার দেখার ইচ্ছে ছিল না, প্রায় জোর করেই....। এখন মনে হচ্ছে....

– কিনতে চান?

– ভাবছি।

– কতটা জমি ?

– দু'কাঠা মতন। একটু কম আছে।

–কী রকম চাইছে?

– এক লাখ পনেরো। মানে কাঠা প্রায় ষাট হাজার। জামাইবাবু অবশ্য বলছিল কিছু কমতেও পারে।

কমলেশ একটুক্ষণ চোখ কুঁচকে রইল। তারপর বলল, – প্রাইস তো রিজনেবল্‌ই মনে হচ্ছে। আমাদের সোদপুরের দিকে তো এখন সত্তর-আশি.... তাও খানিকটা ভেতরে। পছন্দ হলে ডিলে না করে কিনে ফেলুন।

– কিন্তু একটা প্রবলেম হচ্ছে যে! বাড়িতে এসে বলেছিলাম, বোড়াল নাম শুনেই ছেলেমেয়ে যা নাক কুঁচকোল।

– কেন, বোড়াল তো এখন বেশ ভালো জায়গা!.... আমি অবশ্য ওদিকে বিশেষ একটা যাইনি। একবার শুধু একটা বিয়েতে বরযাত্রী হয়ে....। প্রচুর নতুন নতুন ঘরবাড়ি হয়েছে, রেগুলার বাস-টাস চলছে.....। বলতে বলতে থমকাল কমলেশ, – অবশ্য আপনার ছেলেমেয়েদের একটু আপত্তি হওয়ারই কথা। থাকে একদম হার্ট অফ দা সিটিতে, বালিগঞ্জের মতো জায়গায় বর্ন অ্যান্ড ব্রটআপ....

– ওইটিই তো হয়েছে মুশকিল। বাড়ি-জমিতে ওদের আগ্রহই নেই। দুজনেরই এক রা, কিনতে হলে ফ্ল্যাট কেনো। ধারে কাছে কোথাও।

– ওরেব্বাস, বালিগঞ্জে ফ্ল্যাট কিনবেন?

– একটু আধটু সরতে ওরা রাজি। এই ধরুন ঢাকুরিয়া, কী নিউ বালিগঞ্জ, মেরেকেটে সন্তোষপুর যাদবপুর.....

– ওদিকেও কি ফ্ল্যাটের কম দাম! বিকাশ তো ঢাকুরিয়াতে থাকে, ওর মুখে শুনছিলাম মিনিমাম আটশো-নশো টাকা স্কোয়্যার ফিট! তাও বাসস্ট্যান্ড

থেকে বেশ ভেতরে। একটা পায়রার খোপ নিলেও আপনার পাঁচ-ছ' লাখ বেরিয়ে যাবে। অবশ্য আমাদের হাউস বিল্ডিং লোনের অ্যামাউন্টও বাড়ছে। শুনছিলাম পাঁচ লাখ লিমিট হবে।

– সে টাকা বুঝি শোধ করতে হবে না? মাইনে থেকে তিন চার হাজার কাটলে খাব কী? অর্পিতা শুকনো হাসল,–জমিটা খুব ভালো ছিল, জানেন। চারধারে সবুজ, পাশে একটা পুকুর, দু'পা হাঁটলেই বাস, হাত বাড়ালেই বাজার.....

–তাহলে চোখ-কান বুজে কিনেই ফেলুন। চেপেচুপে দামটা লাখে নামান... টাকা যেটুকুনি শর্ট পড়বে পি এফ থেকে নিয়ে নিন। কমলেশ ক্ষণকাল থেমে থেকে অনুচ্চ স্বরে বলল,– ছেলেমেয়েকে বোঝান ভালো করে। আপনার হেল্‌পলেস অবস্থাটা তো ওরা ছোটবেলা থেকেই দেখছে। কত কষ্ট করেছেন আপনি, একা একা ওদের জন্য যে লড়াইটা আপনি চালিয়ে যাচ্ছেন.....

ওফ্, ঘুরে ফিরে সেই করুণাবাক্য! অর্পিতার অফিসের বেশির ভাগ পুরুষই তো কম-বেশি অর্পিতার সমান মাইনে পেয়ে একাই সংসার টানছে, সন্তান প্রতিপালন করছে। অভাব-অনটন তাদেরও আছে, অনেকেরই ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না। লড়াই তারাও করছে, কই তাদের নিয়ে তো এমন আহা-উহু হয় না ? মেয়েদের জন্য পুরুষরা সব সময়েই একটা মাপকাঠি নিয়ে বসে আছে। ভাবে কি? পুরুষ বিনা সংসার অচল?

অপ্রসন্ন ভাবটা কমলেশকে বুঝতে দিল না অর্পিতা। এরকম মধ্যযুগীয় শংসাপত্র তাকে তো বারো বছর ধরেই হজম করতে হচ্ছে। ঘরে-বাইরে, আত্মীয়-স্বজন মহলে, সর্বত্র। কপাল।

কমলেশের সঙ্গে আরও দু একটা কথা বলে অর্পিতা নিজের আসনে এল। বেলা অনেকটা গড়িয়েছে, আলাপ-আলোচনা মুলতুবি রেখে প্রায় সকলেই এখন কাজে ব্যস্ত। শিখা যে শিখা, সেও ম্যাগাজিন বন্ধ করে ফাইলে নিমগ্ন। অর্পিতাও নোটশিটে ডুবল। মাথা তুলল আধ ঘণ্টাটাক পর। চোখ জ্বলছে খুব, মণিদুটো টনটন করছে। চশমা খুলে চোখের পাতা টিপল আস্তে করে। ব্যথা ব্যথা ভাব কমল অল্প। চশমার পাওয়ার বাড়ল কি? ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। ওঃ, সেও তো এক ঝকমারি। চোখের ডাক্তাররা এত বেশিক্ষণ বসিয়ে রাখে!

চোখকে সতেজ করার জন্য জানলার বাইরে দৃষ্টি ফেলল অর্পিতা। আশেপাশে তেমন উঁচু বাড়ি নেই, তাদের এই চারতলা থেকে বেশ খানিকটা খোলা আকাশ দেখা যায়। সকাল থেকে নীল আর মেঘে লুকোচুরি চলছিল,

এখন আকাশ গাঢ় ধূসর। বৃষ্টি নামবে কি? মনে হতেই চেয়ারে ঝোলানো ঢাউস ভ্যানিটি ব্যাখগানা অর্পিতা ছুঁয়ে দেখল একবার। নাঃ, ছাতাটা আছে। চট করে স্মরণ করার চেষ্টা করল ছুটির পর কী কী কাজ আছে আজ। পাড়ার দোকানের চা পাতাটা ভালো নয়, চামড়ার গুঁড়ো গুঁড়ো লাগে, লালবাজারের মুখ থেকে চা কিনতে হবে। বুবলির মাস্টারমশাই জীবন-বিজ্ঞানের জন্য একটা রেফারেন্স বই-এর নাম দিয়েছেন, বইটা গড়িয়াহাট রাসবিহারী চত্বরে পাওয়া যাচ্ছে না, আজ একবার কলেজ স্ট্রিটে গিয়ে দেখবে নাকি? থাক, আজ আকাশের গতিক সুবিধের নয়, জোর নামলে চিত্তির। কমলেশবাবুকে বললে হতো, উনি তো হেঁটেই শেয়ালদা যান, যদি একবার বইপাড়া ঘুরে .....। উঁহু, নিজের কাজ নিজেই করা ভাল। আর কী একটা যেন করার ছিল আজ? কী যেন? সাবান? বিস্কুট? ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। ফেরার পথে ইলেকট্রিকের দোকানে যেতে হবে। ছোট ঘরের ফ্যানের রেগুলেটারটা কবে থেকে খারাপ হয়ে আছে, লালটুকে বলে বলে মুখের ফেকো উঠে গেল। আজ বাদে কাল বর্ষা তো নামবেই, তখন রাতভর ফুলস্পিডে ফ্যান ঘুরলে তুইই তো হেঁচে কেশে মরবি! এত্ত ভুলো মন হয়েছে ছেলেটার! পর পর তিন দিন গ্যাসের দোকানে নাম লেখাতে ভুলে গেল! সতেরো দিনে ডেলিভারি দিচ্ছে, কী যে হবে এই মাসে? ইশ্, শোওয়ার ঘরের জানলা আজ বন্ধ করে বেরোনো হয়নি। বৃষ্টি এলে বিছানা ভিজে জাব হয়ে যাবে! বুবলিটা মনে করে বন্ধ করলে হয়।

সন্তোষ টেবিলে টেবিলে ঘুরছে। টিফিন আওয়ারের পর এবার টি টাইম। চোখা চোখা মন্তব্য এবার উড়তে শুরু করেছে হলঘরে। সবই প্রায় সন্তোষের উদ্দেশে।

—কী কাঠের গুঁড়ো দিয়ে চা বানাচ্ছিস রে সন্তোষ?

—অ্যাহ্, আজ চিনির বদলে স্যাকারিন দিয়েছিস নাকি? তেতো লাগে কেন?

—আমার কিন্তু এটা নিয়ে চব্বিশটা হল । হিসেবে জল মেলাস না।

সন্তোষ নির্বিকার। বধির সেজে থাকলেই সন্তোষের নাফা। সে এই অফিসেরই পিওন, চা বিক্রি তার উপরি কামাই। মাসিক হিসেবে গরমিল উপরির ওপর বোনাস।

অর্পিতা অবশ্য দিনের দাম দিনেই মেটায়। খাতা লেখালেখির ঝামেলায় যাওয়া তার একেবারেই না-পসন্দ্। তেতো মুখে বিস্বাদ চায়ে চুমুক দিতে দিতে পয়সা বার করছিল, এ জি এমের খাস পিওন মানিক এসে হাজির,—

দিদিমণি, স্যারের ঘরে আপনার ফোন।

স্যারের ঘরে কেন? অর্পিতা রীতিমতো অবাক। তার ফোন এলে তো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার দীপঙ্কর রায়ের টেবিলে আসে! ওই নাম্বারটা দেওয়া আছে সবাইকে!

ভুরুতে ভাঁজ ফেলে এ জি এম-এর ঘরের দিকে এগোল অর্পিতা। সামান্য অস্বস্তিও আছে সঙ্গে। এ জি এম বিমল করগুপ্ত অতি সম্প্রতি বদলি হয়ে এসেছে শিলিগুড়ি থেকে। ভদ্রলোকের ব্যবহার-ট্যবহার এমনিতেই ভালোই, তবে বড় বেশি নারীকাতর। মেয়েদের পেলেই যত রাজ্যের ভ্যাজারাং ভ্যাজারাং শুরু করে দেয়, সহজে ছাড়ান পাওয়া কঠিন।

বিমল আজ কী নিয়ে যেন খুব ব্যস্ত। জোর আলোচনা চলছে লিগাল অফিসারের সঙ্গে। আঙুল তুলে রিসিভারটা দেখিয়ে দিল অর্পিতাকে।

ভুরুতে ভাঁজটুকু নিয়েই ফোন তুলল, অর্পিতা,–হ্যালো?

লাইনে বিশ্রী ক্যারকেরে আওয়াজ। ক্ষীণ একটা কণ্ঠ শোনা গেল,– মিসেস সেন বলছেন? আমি আসানসোল থেকে বলছি।

–কোত্থেকে?

–আসানসোল। আসানসোল থেকে।

আসানসোল থেকে আবার কার ফোন? ভাবনাটার সঙ্গে সঙ্গে সহসা মস্তিষ্কে বিদ্যুৎঝলক। অর্পিতার শরীর আপনা আপনি শক্ত হয়ে গেল।

–শুনতে পাচ্ছেন ম্যাডাম? আপনি মিসেস অর্পিতা সেন তো?

–হ্যাঁ.....

–আপনার হাজব্যান্ড.... মানে শুভেন্দু সেন গুরুতর অসুস্থ। ওঁকে আসানসোল হসপিটালে ভর্তি করা হয়েছে.....আমি শুভেন্দু সেনের কলিগ বলছি, রথীন দাস। হ্যালো ম্যাডাম..... হ্যালো...হ্যালো.....

তীব্র ঝিঁঝিঁর ডাক। ক্ষীণ কণ্ঠ ক্ষীণতর হতে হতে ডুবে গেল। কুঁক কুঁক আওয়াজ হচ্ছে লাইনে আর্তনাদের মতো।

রিসিভার আর একটুক্ষণ কানে চেপে রাখল অর্পিতা। তারপর ধীরে ধীরে নামিয়ে দিয়েছ। থম থম করছে মুখ।

বিমল জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে,–কী হলো? কেটে গেল?

অচেতনের মতো মাথা নাড়ল অর্পিতা।

হ্যাঁ বলল, নাকি না বলল বোঝা গেল না।

।। দুই ।।

বাড়ি ফিরে তক্ষুনি ছেলেমেয়েকে কিছু বলল না অর্পিতা। বিছানায় ব্যাগ

রেখে সোজা বাথরুমে। মাথার পিছনটা ভয়ানক দপদপ করছে, আগুন ছুটছে শরীরে।

একটা মাত্র উড়ো ফোন সম্পূর্ণ টলিয়ে দিল অর্পিতার জীবনছন্দকে?

কী অনুভূতি হচ্ছে এখন অর্পিতার? বিরক্তি? রাগ? উৎকণ্ঠা? ঘৃণা?

অর্পিতা জানতে চায় না। আর চায় না বলেই মাথাটা আরও তেতে যাচ্ছিল অর্পিতার। আশ্চর্য, কেন সে ভাবতে যাবে ওই বজ্জাতটার কথা? লোকটা বাঁচল কি মরল, তাতে অর্পিতার কী আসে যায়?

চেপে চেপে কল খুলল অর্পিতা। জল নেই। ঘড় ঘড় আওয়াজ। মুমূর্ষু মানুষের অন্তিম নিশ্বাসের মতো। ঝুঁকে দেখল চৌবাচ্চার জলও তলানিতে। সঙ্গে সঙ্গে বুকের মধ্যে কুন কুন করতে থাকা বিচিত্র অনুভূতিটা বিশ্রী তীক্ষ্ণ স্বর হয়ে ঠিকরে এসেছে,–বুবলি.....অ্যাই বুবলি? কলে জল নেই কেন রে?

বুবলি থাকে নিজের ঘোরে ; এক ডাকে তার সাড়া পাওয়া দায়।

লালটুর জবাব উড়ে এল,–বিকেল থেকেই নেই। কলেজ থেকে ফিরে আমিও ভালো করে হাতমুখ ধুতে পারিনি।

–তো পাম্প চালাতে বলিসনি কেন?

–বলেছিলাম। পাম্প নাকি খারাপ হয়ে গেছে।

আবার? অর্পিতার ব্রহ্মতালু জ্বলে গেল। এই এক নতুন খেলা শুরু হয়েছে বাড়িওলার। মাসের মধ্যে পনেরো দিন পাম্প বিকল। বীরেশ মিত্তির নিজেই চায় না পাম্পটা ঠিক থাকুক। ব্যাটা ছিল ঘোড়ার ডাক্তার, এখন স্ক্রু-ডাইভার রেঞ্জ নিয়ে খুটুর খুটুর ইঞ্জিনিয়ারং চালায়, কিন্তু কিছুতেই মিস্ত্রি ডাকে না। আদ্যিকালের মেশিন, অর্পিতারা এ বাড়ি ভাড়া নিয়েছে প্রায় দু যুগ হলো, তখনই ওই মেশিন গড়বড় করতো। এখনও ওই পাম্প রগড়াচ্ছে!

অর্পিতা যেচে বলেছিল, নতুন একটা কিনে নিন, যদি বলেন আমিও নয় কিছু কনট্রিবিউট করতে পারি, পরে সুবিধেমতো মাসে মাসে অ্যাডজাস্ট করে নেওয়া যাবে!

মিষ্টি মিষ্টি করে কত কথা শুনিয়ে দিল কমলাদি! ভাড়াটের কাছ থেকে অ্যাডভান্স নিয়ে পাম্প কিনতে হবে, এখনও আমাদের অত হীন দশা হয়নি অর্পিতা! দাও তো মোটে নশো টাকা, তার থেকে কী কাটব, কীই বা হাতে থাকবে! ঘরের জিনিস যেই বিগড়োতে শুরু করল, অমনি তাকে বিদেয় করতে হবে এ শিক্ষাও আমরা পাইনি ভাই!

অর্পিতা কি বোঝে না ইঙ্গিতটা কোন দিকে? ঠেস অমন সবাই দিতে

পারে, কিন্তু অর্পিতার কী জ্বালা অর্পিতাই জানে। কিছুতেই শান্তিতে থাকতে দেবে না? বেশ তো ছেলেমেয়ে নিয়ে থিতু হয়ে আছে অর্পিতা, তুই থাক তোর মতো, যেভাবে খুশি বাঁচ। চাইলে মরে যা, ফের অর্পিতাকে নিয়ে টানাটানি কেন? অসুখ হয়েছে তো অর্পিতা কী করবে? সেবা করবে গিয়ে? কী আহ্লাদ রে! ঘোরতর অসুখ বাধিয়েছে কি অর্পিতার সমবেদনার আশায়? অর্পিতা সুখে আছে, শান্তিতে না থাক স্বস্তিতে আছে, এই সমাচারে নিশ্চয়ই জ্বলে পুড়ে মরছিল লোকটা! তাই বুঝি এই নাক কেটে যাত্রাভঙ্গের চেষ্টা! বীরেশ মিত্তিরের সঙ্গে দোস্তি ছিল খুব, নেচারটাও একরকম। নিজেরা ভারী ডেকে জল নেব, কাঁড়ি কাঁড়ি পয়সা ধসে যাক কুছপরোয়া নেই, কিন্তু ভাড়াটের যেন সুবিধে না হয়।

ছিড়িক ছিড়িক দু' মগ জল গায়ে ছিটিয়ে অর্পিতা বেরিয়ে এল। শোওয়ার ঘরে এসে শাড়ি পরছে।

বুবলি দরজায়,–মা, আজ কিন্তু গণেশের মা বিকেলে আসেনি।

সব দুর্ঘটনাই কি একদিনে ঘটে? গণেশের মা পুরোনো বিশ্বাসী লোক। সে দুপুরেও একবার আসে, তার কাছে ঘরের চাবিও আছে, ঘরদোর ঝাড়ে, বাসন-কোসন মাজে, টুকিটাকি জলখাবার আর রাতের রান্না সেরে রেখে যায়। সকালেও তো এসেছিল, বিকেলে ডুব?

অর্পিতা কিছু বলবার আগে বুবলি বলল–টিউটোরিয়াল থেকে ফিরে দেখি সব যেমনকে তেমন পড়ে ..... বাসনগুলো আমি মেজে দিয়েছি।

অন্য দিন হলে লক্ষ্মী মেয়ে বলে বুবলির গালে আলতো টোকা দিত অর্পিতা, এখন ভুরু কুঁচকে গেল,–ফ্রিজে কী কী আছে?

–শুধু মাছের ঝোল। সকালেরটা ।

–হুম। অর্পিতা প্রাণপণে নিজেকে স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করল। গলা নামিয়ে বলল, বিকেলে তোরা কিছু খেয়েছিস?

–মুড়ি মেখেছিলাম। চানাচুর দিয়ে। দাদাকে একটা ওমলেটও ভেজে দিয়েছি।... আটা মেখে দিতে হবে?

অবসাদটা ফিরে আসছেই । রুটি করতে আর মন চাইছে না, শরীরও চলছে না যেন। অর্পিতা বলল,–থাক গে, ভাত করে নেব।

বুবলি তবু দাঁড়িয়ে। চোখ বড় বড় করে মাকে দেখছে।

অর্পিতা অস্বচ্ছন্দ বোধ করল। এমন করে তাকায় কেন মেয়ে? চেহারায় কি ছাপ পড়েছে কোনও?

অর্পিতা মুখ ফিরিয়ে নিল,–মাথাটা খুব ধরে আছে রে। এক কাপ চা

খাওয়াবি?

—খাবে কিছু সঙ্গে?

—না। শুধু চা।

বুবলি চলে যাচ্ছে। মেয়ের গমনপথের দিকে অর্পিতা তাকিয়ে রইল কয়েক সেকেন্ড। মেয়েটা যেন ঝটকা দিয়ে হঠাৎই অনেকটা বড় হয়ে গেল! এই তো সবে ফাল্গুনে পনেরো পূর্ণ হয়েছে, হাবভাব এমন করে যেন পূর্ণ বয়স্কা নারী। বড্ড মুডিও হয়েছে মেয়ে। ইচ্ছে হল তো সেধে ঘরের কাজ করে দিল, আবার মন না চাইলে কুটো নেড়ে দুটো করবে না। দাদার সঙ্গে খুনশুটিও চলে খুব। এই হয়তো গলা ছেড়ে গান গাইছে, এই মুখে কুলুপ, গালে হাত দিয়ে বসে আছে উদাসীন। টিনএজ্ সিন্‌ড্রোম!

এই বয়সের মেয়েরা বড় বেশি স্পর্শকাতর হয়। শুভেন্দুর অসুখের খবরটা কি বুবলিকে বলবে? শুনে বুবলির কী প্রতিক্রিয়া হতে পারে? শুভেন্দু যখন এ বাড়ি ছেড়ে চলে যায় তখন বুবলি মাত্র তিন বছরের। বুবলির মনে কি বাবার কোনও স্মৃতি আছে? অবশ্য স্মৃতি না থাকাটাও তো এক ধরনের স্মৃতিই।

বিছানা জয়পুরি বেডকভারে ঢাকা। গেল পুজোয় দিদি-জামাইবাবুরা রাজস্থানে বেড়াতে গেল, অর্পিতাদেরও যেতে বলেছিল খুব করে, বাসনা থাকলেও অর্পিতার হয়ে ওঠেনি। বুবলির ক্লাস নাইন, লালটু ফার্স্ট ইয়ারে অনার্স নিয়ে পড়ছে। এ অবস্থায় মাস্টার টিউটোরিয়াল কামাই করে তিন হপ্তার জন্য কী ঘুরতে যাওয়া যায়? দিদিই এই বেডকভারটা এনে দিয়েছিল। দেখতে ভারি সুন্দর, হাতি আর উটের মনোরম কারুকাজ। বুবলি প্রায়ই পাতছে চাদরটা, বেশি কাচাকুচিতে নষ্ট হয়ে না যায়।

পাশবালিশে মাথা রেখে শুল অর্পিতা। প্রকাণ্ড খাটের ঠিক মাঝখানটিতে। পাখা ঘুরছে বনবন, অথচ গায়ে যেন একটুও হাওয়া লাগছে না। ছুটির পর ঝিরঝির বৃষ্টি হচ্ছিল অফিসপাড়ায়, এদিকে দক্ষিণ কলকাতা খটখটে, গরমটাও বেজায় ভ্যাপসা। স্নানটাও মনোমতো হলো না, চিটচিট করছে গা। বিচ্ছিরি, বিচ্ছিরি।

অর্পিতা গায়ের আঁচল সরিয়ে দিল। পাশ ফিরেছে। আসানসোল থেকে যে ভদ্রলোক ফোন করেছিল, কী যেন নাম বলল? রথীন? না ব্রতীন? ওফ্, টেলিফোনটা এমন গণ্ডগোল করল! অবশ্য নাম দিয়ে অর্পিতার হবেই বা কী? শুভেন্দু বাঁচল না মরল তাতেই বা তার কী আসে যায় এখন? লোকটা তো অর্পিতাদের কাছে প্রায় মৃতই। কোনও সম্পর্ক নেই, যোগাযোগ নেই....।

অর্পিতারাও রাখতে চায় না খবর। তবুও লোকটার বাঁচা আর মরে যাওয়ার মধ্যে একটা তো সূক্ষ্ম ব্যবধান তো আছেই। নইলে অর্পিতা এখনও সিঁদুর পরে কেন? খবরটা পাওয়ার পর কেনই বা হৃদয়ে এই ওঠাপড়া? ঘৃণা হোক, বিরক্তি হোক, অপমানবোধ হোক, কিছু তো একটা আছেই।

মাথার তাতটা বেড়েই যাচ্ছে। হলো কি শুভেন্দুর? লিভার পচিয়ে ফেলল? নাকি আরও কোনও ঘৃণ্য ব্যাধি?

স্বাভাবিক, খুবই স্বাভাবিক। অত অনাচার শরীর কতদিন সহ্য করবে? বয়সটাও তো কম হলো না! অত ঘি তেল মশলার দিকে ঝোঁক, নারীসঙ্গ করার বিকৃত লালসা, সুরাপনে অত আসক্তি... দেহ কি এক সময়ে না এক সময়ে প্রতিশোধ নেবে না? বছর তিনেক আগে নাকি একবার বেহেড মাতাল হয়ে রাস্তায় পড়ে মাথা ফাটিয়েছিল শুভেন্দু, বেশ কিছু দিন শয্যাশায়ী ছিল। সমাচারটা শুভেন্দুর দাদার মুখে শোনা। সত্যি-মিথ্যে ঈশ্বরই জানেন। দাদা-বোনরা তো সারাজীবন ভাইয়ের নিন্দেমন্দ করেই খালাস, ভাইকে শোধরানোর চেষ্টা করেছে কোনওদিন? সব যার যার তার তার। পাছে সামান্যতম দায়িত্বও নিয়ে ফেলতে হয় এই আশঙ্কায় অর্পিতাদের খোঁজখবরই সেভাবে রাখে না। ওই মাঝে মাঝে অতিথির মতো এল, কী কেমন আছ, ভালো আছ গোছের কুশল বিনিময়, কিম্বা কাজেকর্মে নেমন্তন্ন, ব্যস। তার বেশি আর তাদের সঙ্গে অর্পিতাদের কীই বা সম্পর্ক? লালটু তো আজকাল যেতেই চায় না জ্যাঠা-পিসির বাড়ি।

অর্পিতা কি তাদের খবরটা দেবে? তোমাদের মায়ের পেটের ভাই, তোমরাই দ্যাখো! কে জানে হয়তো তারা আগেই জেনে গেছে! জেনেও ঘাপটি মেরে বসে আছে! যার স্বামী সে বুঝুক!

তো অর্পিতা কী করবে? ছুটবে? কেন ছুটবে? তারই বা কিসের দায়?

খাওয়া-বসার ফালিটায় টিভির আওয়াজ। কোনও খেলা চলছে বোধহয়। লালটুটা ভয়ানক ক্রিকেট-ফুটবলের পোকা। একটা জয়ধ্বনির মতো উঠছে, কমেও গেল উল্লাসটা।

অর্পিতা গলা ওঠাল,—লালটু?

—ডাকছ মা?

—হচ্ছেটা কি? টিভি এত জোরে কেন?

—এই একটু স্কোরটা দেখছি মা।

—আস্তে চালাও। কানে লাগছে।

কমল শব্দ। ছেলেমেয়েকে নিয়ে বেশি খ্যাচাখেচি করতে হয় না অর্পিতাকে,

বুবলি লালটু দুজনেই মোটামুটি বাধ্য। সমীহ করে মাকে। বোধহয় অর্পিতার দুঃখটা বোঝে।

বুবলি চা দিয়ে গেছে। গরম চায়ে চুমুক দিতে মন্দ লাগছে না। কিন্তু মাথাটা ছাড়ে না কেন? শুভেন্দুর জন্য সত্যিই কি অর্পিতা বিচলিত হয়ে পড়ল? নাকি এ রুটিন মাফিক মাথা জ্বালা? মেনোপজের সময় হয়ে এল, শরীর বুঝি তা জানান দিচ্ছে। শিখাদি বলছিল, একদিন ডাক্তারের কাছে চল্। এখন নাকি আরো অনেক উপসর্গ দেখা দেবে, ঠিক মতো হরমোন ট্রিটমেন্ট করালে তেমন সমস্যা হবে না। গেলে তো হয়, তবে আবার সেই ডাক্তারের হ্যাপা.....

ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি শুরু হলো হঠাৎ। কাপ নামিয়ে তড়িঘড়ি উঠে জানলা বন্ধ করল অর্পিতা। তাদের অংশটা এ বাড়ির একেবারে পিছন ভাগে। জানলার খানিকটা তফাতে ছোট্ট একখানা টিনের চালা, বীরেশবাবুর ছেলে নিজের ব্যবসার মালপত্র রাখে। টিনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বৃষ্টিকণারা কর্কশ বাজনা বাজাচ্ছে। এ শব্দটাও অর্পিতার কানে লাগছিল বড়।

অর্পিতা আর শুল না। রান্নাঘরে এসে ভাতের জল বসাল। লালটু শুধু মাছের ঝোল দিয়ে খেতে পারে না, দুটো আলুও ছাড়ল জলে। ঘি দিয়ে মেখে দেবে। বৃষ্টির তেজ বাড়ছে ক্রমশ। রান্নাঘরের খুপরি জানলাটা দিয়ে ঝিলিক ঝিলিক বিদ্যুৎ ঢুকে পড়ছে। কড়কড়াৎ ধ্বনিতে বাজ হেঁকে উঠল। শুভেন্দুই কি টেলিফোনটা করতে বলেছিল? মরণকালে হঠাৎ অর্পিতাকে মনে পড়ল যে? মনে হয় খুব ফেঁসেছে, টাকাপয়সা হাতে নেই, অর্পিতা যদি এসে উদ্ধার করে....! নির্লজ্জ! নিঘিন্নে! দিদি-জামাইবাবুর সঙ্গে একবার কথা বলতে পারলে হত। ওরাই তবু সুখেদুঃখে অর্পিতার পাশে থাকে, ভালোমন্দ বুদ্ধিটা দেয়। কিন্তু এখন কোথায় ফোন করতে দৌড়বে? বাড়িতে টেলিফোনটা নেব নেব করেও নেওয়া হচ্ছে না। নাঃ, এবার দরখাস্তটা করেই দিতে হবে। আজকাল নাকি তাড়াতাড়ি কানেকশান দিয়ে দিচ্ছে। সকালে অফিসে গিয়েই দিদিকে ফোন করবে কি? কিন্তু লোকটা যে ভাবে বলল....দেরি হয়ে যাবে না তো?

বুবলি-লালটু দুজনেই টিভির সামনে। জোরে জোরে চলছে না টিভি,তবু তার শব্দ ভাসছে বাতাসে। মিশ্রধ্বনি। একটুক্ষণ লালটুর পছন্দ মতো খেলা, খানিক পরেই বুবলির হিন্দি সিরিয়াল। বিজ্ঞাপনের বিরতিতে লালটু বোধহয় চ্যানেল ঘুরিয়ে দিচ্ছে। খেলার হর্ষ আর নাটুকে বিষাদ সব কেমন একাকার মনে হয়।

টেবিলে থালা-গেলাস সাজিয়ে ছেলেমেয়েকে খেতে ডাকল অর্পিতা। খেতে

বসে লালটু বলল,–মা জানো, আজ একটা কাণ্ড হয়েছে।

অর্পিতা অন্যমনস্ক ছিল। আলগোছে জিজ্ঞেস করল,– কী কাণ্ড?

–আজ ওপরে জেঠুর কাছে প্রোমোটার এসেছিল।

–কেন?

–বারে, বুঝতে পারলে না? পাড়ার সব পুরোন বাড়িতেই তো প্রোমোটাররা ছিপ ফেলছে। দরজা নক করে করে কার্ড দিয়ে আসছে। কত কী অফার! দশ লাখ, বিশ লাখ, সঙ্গে ফ্ল্যাট....। জেঠুর কাছে ইয়া এক ফরেন কার হাঁকিয়ে এসেছিল।

–তুই জানলি কী করে লোকটা প্রোমোটার? বুবলি তর্ক জুড়ল,–গাড়ি চড়ে এলেই বুঝি প্রোমোটার হয়?

–আমি লোকটাকে চিনি। ওই তো রাজাদের বাড়িটা ভাঙছে।

–রাজাদাদের বাড়িও ভাঙা হয়ে যাচ্ছে? ওমা, কিছুই তো জানি না।

–তুই একটা লেবদুস। বোনকে উড়িয়ে দিয়ে মার দিকে ফিরল লালটু,– আচ্ছা মা, এ বাড়ি ভাঙা হলে আমরাও তো একটা ফ্ল্যাট পেতে পারি! এ বাড়িতে আমরা তো কম দিন নেই। কত বছর হলো যেন?

–একুশ-বাইশ বছর হবে।

–তাহলে? আমাদের তো রাইটই জন্মে গেছে। রাজাদের বাড়ির ভাড়াটেও তো ফ্ল্যাট পাচ্ছে। রাজাই বলছিল, ভাড়াটেরা যতটা এরিয়া নিয়ে আছে প্রায় ততটাই নাকি...। তুমিও সাফ জেঠুকে বলে দেবে হয় ক্যাশ দাও, নয় ফ্ল্যাট। নইলে আমরা বাড়ি ছাড়ব কেন?

–সে দেখা যাবেখন। আগে আমাদের জানাক। উঠে যেতে বলুক। তারপর না হয়....

অর্পিতা কথাটা শেষ করল না। মুখ ফুটে লালটুকে বলতেও পারল না এ বাড়ি ভাঙা হলে ফ্ল্যাট টাকা কিছুই দাবি করার অধিকার অর্পিতাদের নেই। কারণ ভাড়ার রসিদ এখনও কাটা হয় শুভেন্দুর নামে। লালটু-বুবলিও অবশ্য জানে সে কথা। তবে ব্যাপারটা এমন অবধারিত, এমনভাবে চলে আসছে যে অর্পিতারও কথাটা স্মরণে থাকে না সব সময়ে। একটা মানুষ না থেকে কেমন নিঃসাড়ে একটা অস্তিত্ব বজায় রেখেছে এ সংসারে! হয়তো সঙ্গে সঙ্গে একটা অধিকারও! বীরেশকে কেন বলতে পারেনি অর্পিতা, ভাড়া যখন আমিই দিই, রসিদটাও আমার নামেই হোক? আসলে অর্পিতা সে ভাবে ভাবেইনি কখনো। কিছু না ভেবেই টিকিয়ে রেখেছে শুভেন্দুর নামটাকে। সিঁথিতে সিঁদুর ছোয়ানোর

মতো।

কিন্তু তাই কি? হৃদয়ের অতলে কোনও এক আশা অর্পিতা পুষে রাখেনি তো, লোকটা একদিন অনুতপ্ত হয়ে ফিরে আসবে, সব কিছু স্বাভাবিক হয়ে যাবে আবার? যাকে ইংরিজিতে বলে, দে উইল লীভ হ্যাপিলি এভার আফটার?

অবাস্তব, হাস্যকর চিন্তা। এমনটা হতেই পারে না।

তবু মনটা খচখচ করেই যাচ্ছে। ওই নামটুকু দিয়েই লোকটা যেন পরোক্ষে সামান্য ঋণী করে রেখেছে অর্পিতাকে। ডিভোর্স করলেই তো ল্যাটা চুকে যেত, কেন অর্পিতা সেটাই বা করেনি? প্রয়োজন অনুভব করেনি? তাই যদি হয়, তবে মাথায় এখনও এই লাল দাগ কেন? হতে পারে দাগটা হালকা, ভালো করে লক্ষ না করলে দেখাই যায়না, তবু আছে তো! অর্পিতা রেখেছে তো! এক সেকেন্ডের লক্ষ ভগ্নাংশ হলেও অর্পিতা ওই দাগের পিছনে সময় খরচ করে তো!

অর্পিতা বড় একটা নিশ্বাস ফেলল। ঝপ করে বলল,–কাল ভোরে আমায় একবার আসানসোল যেতে হবে।

লালটু-বুবলি কোরাসে বেজে উঠল,– হঠাৎ? আসানসোল?

–অফিসে আজ ফোন এসেছিল। ওখানে তোদের বাবা খুব অসুস্থ। হাসপাতালে আছে।

লালটু-বুবলি মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে। লালটু অস্ফুটে বলল, তুমি যাবে?

–একবার দাঁড়িয়ে আসি। কী হয়েছে, না হয়েছে...!

লালটু গুম হয়ে গেল। ভাত খুঁটছে। বুবলিও চুপ। চোরা চোখে দেখছে মাকে।

অর্পিতা গলা ঝাড়ল। অনেকটা যেন কৈফিয়তের ভঙ্গিতে বলল,– ফোন করে বলল খুব সিরিয়াস অবস্থা.....

–কী হয়েছে?

–জানি না। পুরো কথার আগেই ফোনটা কেটে গেল।...তাই ভাবছিলাম.....

লালটু গোমড়া মুখে বলল,–তোমার যাওয়াটা কি জরুরি, মা?

প্রশ্নটায় যেন চ্যালেঞ্জের সুর? নাকি নিষেধের ? নিখুঁত পড়তে পারল না অর্পিতা। অস্পষ্ট ভাবে মাথা নেড়ে বলল,–তোরা কাল সকালেই মাসিকে একটা খবর দিয়ে দিস। বলিস্, পারলে যেন এখানে এসে থাকে। আমি এক দু'দিনের মধ্যেই ফিরে আসব।

বৃষ্টি ধরে গেছে। বাইরে শব্দ নেই। খাবার টেবিলেও অসহ্য নীরবতা। অদূরেই বালিগঞ্জ রেললাইন, তীক্ষ্ণ হুইসল্ বাজিয়ে চলে গেল একটা ট্রেন। গভীর রাত ছাড়া এই আওয়াজ এত তীব্র শোনায় না এ বাড়িতে, এখন আওয়াজটা কাঁপছে বাতাসে। শব্দ আর নৈঃশব্দ্যের লড়াই চলছে যেন।

অস্বস্তি। বড় অস্বস্তি!

।। তিন ।।

লিভার-টিভারের অসুখ নয়, সেরিব্রাল অ্যাটাক হয়েছিল শুভেন্দুর। মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ। আক্রমণটা বেশ বড়ই ছিল, শুভেন্দুর ডান অঙ্গ একদমই পড়ে গেছে, বাক্‌শক্তিও লোপ পেয়েছে প্রায়। তবে বেঁচে গেছে এ যাত্রা। শুভেন্দুর কপাল ভালো, ঘটনাটা অফিসেই ঘটেছিল. তার ডেরায় নয়। দিন আষ্টেক আগে ক্যান্টিনে দুপুরের খাওয়া সেরে এসে বাথরুমে গিয়েছিল, সেখানেই হঠাৎ অজ্ঞান, সহকর্মীরাই ধরাধরি করে নিয়ে যায় হাসপাতালে, তারাই ছুটোছুটি করে বন্দোবস্ত করেছিল চিকিৎসার। অফিসের দু'চারজনের সঙ্গে ডাক্তার মহলের ভালোই চেনাজানা, সেই সুবাদে ডাক্তার-নার্সদেরও মোটামুটি মনোযোগ পেয়েছে শুভেন্দু। তবু এখনও তার দশা অকহ্‌তব্যই।

এতটা খারাপ অবস্থা, অর্পিতার কল্পনায় ছিল না। মানুষটা নির্বাক নিষ্কম্প পড়ে আছে, কথা বলতে গেলে শুধু গঁ গঁ জান্তব আওয়াজ বেরোচ্ছে গলা দিয়ে, অঝোরে চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে আসছে, এ দৃশ্য নিরাসক্ত ভাবে হজম করা কঠিন। অন্তত অর্পিতার ততটা মনের জোর নেই। ভাবা যায়, এই মানুষটাই বেপরোয়া, উদ্ধত, অমিতাচারী শুভেন্দু সেন? কোন মানুষের যে কখন কোন পরিণতি হয়!

হাসপাতালটা মোটামুটি পরিচ্ছন্ন। ধুলোময়লা নেই তেমন, রুগীও বড় একটা গড়াগড়ি খাচ্ছে না মেঝেতে। তবু ওয়ার্ডে কেমন যেন একটা উগ্র গন্ধ। কটু। নিশ্বাস আটকে আসে। শুভেন্দুর বিছানার পাশে মিনিট পাঁচেক দাঁড়িয়ে থেকে বাইরে বেরিয়ে এল অর্পিতা।

প্যাসেজে রথীন। স্টেশনে নেমে প্রথমে হাসপাতালেই এসেছিল অর্পিতা। শুভেন্দুকে ক্ষণিকের জন্য দেখেই ছুটেছিল তার অফিসে। তারপর থেকে রথীন সঙ্গে সঙ্গেই আছে। বছর পঁয়তাল্লিশ বয়স, বেঁটেখাটো, গাঁট্টাগোট্টা, দেখে বেশ দায়িত্বশীল প্রজাতির প্রাণী বলেই মনে হয়।

রথীন এগিয়ে এল। মৃদু গলায় বলল,—একইরকম না?

—হ্যাঁ।

–যাক, ক্রাইসিসটা কেটেছে। এতেই আমরা অনেকটা নিশ্চিন্ত।

–হুম। অর্পিতা ভদ্রতা করে বলল,– আপনাদের খুব পরিশ্রম গেল কদিন।

–পাশাপাশি টেবিলে কাজ করি, এইটুকুন তো.....

শুধু ওইটুকুই সম্পর্ক তো? তার বেশি কিছু নয়.....? নাকি শুভেন্দুর স্যাঙাত? মানুষের চেহারা আপাতভাবে যা ধারণা গড়ে দেয় তা কি সব ক্ষেত্রেই সঠিক? শুভেন্দুকেই দেখে, কিম্বা তার মোলায়েম কথাবার্তা শুনে কে ধারণা করতে পারবে ওই লোকটি অতি নোংরা জীবনযাপনে অভ্যস্ত? তবে যাই হোক, রথীন খেটেখুটে একটা লোকের প্রাণ বাঁচিয়েছে, একটু ধন্যবাদ তো তার প্রাপ্যই। অনর্থক রুক্ষ ব্যবহার করে রথীনের চোখে অর্পিতা ছোট হবে কেন?

বাইরে মেঘলা বিকেল। মলিন আলো। থম মেরে আছে আকাশ। ভিজিটিং আওয়ার চলছে, হাসপাতালের করিডোরে উদ্বিগ্ন মানুষের ঘোরাফেরা। হাসিমুখেও ঘুরছে কেউ কেউ, তবে তারা যেন এই পরিবেশে বেমানান।

রথীন মাথা নাড়তে নাড়তে বলল,–ওফ্! আপনার ফোন নাম্বার জোগাড় করতে যে কী ঝকমারি গেছে!... কী আর বলব আপনাকে, আপনি তো জানেনই শুভেন্দুদা কী ধরনের মানুষ.....কোথ্থাও আপনাদের ফোন নাম্বার ঠিকানা কিছুই লিখে রাখেনি।...আপনাদের ব্রাঞ্চঅফিসও তো প্রথমে কিছু হদিস দিতে পারে না, বহু কষ্টে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে.....

অর্পিতা হু-হ্যাঁ কিছু করলো না। শুনছে চুপচাপ।

রথীন ফের বলল,–আপনি কি আজ ডাক্তারবাবুর সঙ্গে দেখা করবেন?

অর্পিতাকে নীরব দেখে রথীন আবার বলল,–অবশ্য কালও আমার ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথা হয়েছে। উনি বলেছিলেন আরও দু-চার দিন রাখতে হতে পারে।.... কিন্তু তারপর কী হবে?

–মানে?

–অর্থাৎ মোটামুটি ছাড়া পাওয়ার অবস্থায় এলে ওঁকে নয় রিলিজ করা হলো তারপর আসানসোলে উনি থাকবেন কী করে? তখন তো চাই লঙ্ টার্ম ট্রিটমেন্ট। রেগুলার ফিজিওথেরাপি করাতে হবে, সেবাশুশ্রূষা, ওষুধ-বিষুধ খাওয়ানো.....

অর্পিতার মুখ দিয়ে প্রায় বেরিয়ে যাচ্ছিল, আপনার শুভেন্দুদার সহচরীরা কি নেই এখানে ? যাঁদের ঘরে রাত কাটান আপনাদের শুভেন্দুদা?

নিজেকে সামলে নিয়ে বলল,– হ্যাঁ, সেটা তো একটা ভাবনার কথাই।

রথীন হঠাৎই উত্তেজিত ভাবে বলল,– শুভেন্দুদা যে কী! টাকাপয়সাও

কিছুই নেই। তিন তিনটে লোন চলছে, কেটেকুটে যা হাতে পান তাও মাসের অর্ধেক না যেতেই... আপনাকে আর কী বলব, আপনি তো সবই জানেন। গত বছরেই পি এফ থেকে ননরিফান্ডেবল লোন নিয়েছিলেন, সেগুলোও যে কোথায় গেল....

অতএব অর্পিতা সেন এসে বোঝা কাঁধে তুলে নিক, এই তো বলার উদ্দেশ্য?

নীরস স্বরে অর্পিতা বলল, – এখনও পর্যন্ত কত খরচ হলো?

–না না, সে নিয়ে ভাববেন না।.... তেমন বিরাট অঙ্ক কিছু হয়নি। ওটা এখনও পর্যন্ত আমরাই চাঁদা তুলে...

ছি-ছি-ছি, মুখে অত লচপচানি মারা শুভেন্দু সেনের কী অবস্থা, দয়া কুড়িয়ে প্রাণ বাঁচাচ্ছে! এর থেকে মরে যাওয়া ভালো।

অর্পিতা বলল, –সে কি, আপনারা কেন খরচ করবেন? কত বিল-টিল হয়েছে আমাকে যদি বলেন....

–সে হবেখন ধীরেসুস্থে।....আপনার এখন সামনে লম্বা খরচা ম্যাডাম...যদি ফিজিওথেরাপিতে রেসপন্ড করে, তাহলেও মিনিমাম ছ'আট মাস। প্লাস মেডিসিন যে কত যাবে!

রথীন ধরেই নিয়েছে বোঝাটা কাঁধে তুলে নিয়েছে অর্পিতা!

মলিন হেসে অর্পিতা বলল,–কিন্তু আমার পক্ষে তো এখানে থাকা এখন সম্ভব নয়।

–থাকবেন কেন? আপনি নিয়ে চলে যান। ডাক্তারবাবুকে বলছি যদি কাল-পরশুর মধ্যে রিলিজ করে দেন, সোজা একটা অ্যাম্বুলেন্সে করে.....

–কিন্তু দু'তিন দিনই বা থাকি কী করে? বাড়িতে সেভাবে কিছু বলে আসিনি.....

রথীন এবার ঈষৎ চঞ্চল। ভাবছে বোধহয় পাখি উড়ে গেল! ঝটপট বলে উঠেছে, –সে তো একটা টেলিফোন করে দিলে হয়ে যায় ম্যাডাম। আর থাকাটাও তো কোনও সমস্যাই নয়। আমার বাড়িতেই থেকে যেতে পারেন। আমার মিসেস মেয়ে সবাই আছে, আপনার কোনও অসুবিধে হবে না। টাকা পয়সা নিয়েও চিন্তা করবেন না। তেমন হলে আমরা অ্যাম্বুলেন্স ভাড়া-টাড়া করে .....

–ধন্যবাদ। সেটুকুনি আমার কাছে আছে।

অবিকল কলে পড়া ইঁদুরের মতো বলে উঠল অর্পিতা। দুঃখ-উদ্বেগ ছাপিয়ে ঠেলে উঠছে বিরক্তি, তবু যেন হাসিও পাচ্ছে। শুভেন্দু সেন এমন বিপুল খ্যাতি

অর্জন করেছে যে তার সহকর্মীরা মানে মানে তাকে পাচার করে দিতে পারলে নিষ্কৃতি পায়! অবশ্য হাসপাতালে দৌড়ঝাঁপ করা তাও সম্ভব, কিন্তু এমন একটা ভেজিটেবল্ বনে যাওয়া রুগীর ম্যাও কেই বা গায়ে পড়ে নিতে চাইবে?

রথীন আশান্বিত চোখে বলল,–তাহলে আপনি আমার বাড়িতে উঠছেন তো আজ?

অর্পিতা দ্রুত ইতিকর্তব্য স্থির করে নিল। স্পষ্ট গলায় বলল,–না। থাকলে আমি শুভেন্দুর বাড়িতেই থাকব। জায়গাটা এখান থেকে কতদুর?

–খুব বেশি নয়। চেলিয়াডাঙার কাছেই...এই একটু গিয়েই..রথীন ঢোক গিলল–কিছু মনে করবেন না ম্যাডাম, শুভেন্দুদার বাড়িতে আপনি কিন্তু থাকতে পারবেন না।

'কেন' শব্দটা উচ্চারণ করতে গিয়েও গিলে নিল অর্পিতা। শুভেন্দু সেনের বাড়িতে কেন শুভেন্দু সেনের স্ত্রী থাকতে পারবে না এটা অর্পিতার চেয়ে আর কে বেশি জানে!

তবু অর্পিতা এরকম জেদ করেই বলল,– একটা রাত ঠিক কাটিয়ে দিতে পারবো। আপনি প্লিজ দেখুন কালকেই নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা যায় কিনা।

রথীনই পৌঁছে দিয়ে গেল শুভেন্দুর ডেরায়। পাড়াটা যেন কেমন কেমন, বস্তি বস্তি ধরনের। এইরকম পরিবেশই শুভেন্দুর বেশি প্রিয়, অর্পিতা জানে। তাছাড়া মাসের পনেরো তারিখের পরে যার হাতে আর টাকা থাকে না, সে এমন জায়গা ছাড়া কোথায়ই বা থাকতে পারে?

শুভেন্দু একখানা ঘর নিয়েই থাকে। আশপাশে আরও আট-দশ ঘর ভাড়াটে, চেহারা দেখে কাউকেই সমপর্যায়ের মানুষ বলে মনে হয় না। প্রচুর ক্যালর-ব্যালর, চিৎকার-চেঁচামেচি চারদিকে। সঙ্গে একটা বোঁটকা গন্ধও যেন ছড়িয়ে আছে। শেষপ্রান্তে পর পর গোটা তিনেক পায়খানা বাথরুম, সব ভাড়াটেরই ব্যবহার্য।

রথীন বাড়িউলি মহিলাটির সঙ্গে অর্পিতার পরিচয় করিয়ে দিয়ে গেছে,তবু চতুর্দিক থেকে উঁকিঝুঁকি মারার কমতি নেই। সবাই শুভেন্দুর বউ দেখছে!

অর্পিতার গা ঘিনঘিন করছিল। এই পরিবেশে সে একঘণ্টাও বাস করবে কী করে? রথীনের কথা শোনাই উচিত ছিল। এখানে এসেও রথীন বার বার ফিরে যাওয়ার কথা বলছিল, কেন যে কানে তুলতে চাইল না অর্পিতা ? বাথরুমে যাওয়া দরকার, ঘেন্না পিত্তি চেপে ঘুরে এল একবার। যতটা ভেবেছিল ততটা নোংরা নয়, তবু.....।

শুভেন্দুর ঘরখানা বাহুল্যবর্জিত। নিরাভরণ নয়, প্রায় নিরাবরণই বলা যায়। আছে মাত্র একটা পাতলা তোশকপাতা চৌকি, একটা মিটসেফ, আমকাঠের টেবিল-চেয়ার, ট্রাঙ্ক আর একখানা সস্তার আলনা। লুঙ্গি পাঞ্জাবি আর গামছা ঝুলছে আলনায়। কোণে একটি গেলাস-ঢাকা মাটির কুঁজো, দেওয়ালে ক্যালেন্ডার, ছোট্ট আয়না। ক্যালেন্ডারের অর্ধনগ্ন নারী শুভেন্দুর রুচি বহন করছে।

অর্পিতার ভয়ানক তেষ্টা পাচ্ছিল। জোর করে রথীন রুটি-কষামাংস খাইয়ে দিয়েছে, চোরা অম্বলে জ্বলছে গলা, জিভ শুকিয়ে খরখর। কুঁজোতে জল আছে কিনা দেখবে? ম্যাগোঃ, খেলেই বমি হয়ে যাবে। বেরিয়ে বাইরে থেকে কিনে আনবে বোতলের জল? দিদিকেও একটা ফোন করে এলে হয়।

দরজা খোলা রেখে অর্পিতা বেরিয়ে পড়ল। অন্ধকার গাঢ় এখন, এই পাড়াটিও অনুজ্জ্বল, গা ছমছম করছে অল্পঅল্প। অজানা অচেনা জায়গায় এভাবে একা একা রাত্রিবাস জীবনে এই প্রথম। আবার মনে হচ্ছে রথীনের কথাটাই শোনা উচিত ছিল। সেখানেও অবশ্য রথীনের স্ত্রী-মেয়ের করুণাভেজা দৃষ্টি তাকে সহ্য করতে হতো। তা হোক, তবু এর থেকে তো ভালো।

পানের দোকানে দাঁড়িয়ে একটা কোল্ডড্রিঙ্কস খেল অর্পিতা। জল কিনল এক বোতল নয়, দু বোতল। তারপর খানিকটা এগিয়ে এস টি ডি বুথে ঢুকেছে।

জামাইবাবু ধরেছে ফোন। কণ্ঠে রীতিমতো বিস্ময়,–কী ব্যাপার, তুমি এরকম দুম করে চলে গেলে কেন?

–গিয়ে সব বলবো। দিদি কোথায়?

–দিদি তো তোমার ওখানে। কী হয়েছে শুভেন্দুর?

যতটুকু বলার অতি সংক্ষেপে বলল অর্পিতা।

জামাইবাবু গজগজ করছে,–তোমার আমাকে বলা উচিত ছিল। আমি তোমার সঙ্গে যেতে পারতাম।

–সে যা হওয়ার তা তো হয়েই গেছে, কাজের কথা শুনুন। আমি ডাক্তারকে বলে কালকেই রিলিজের ব্যবস্থা করেছি। দুপুর নাগাদ অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে বেরোবো। পৌঁছতে পৌঁছতে হয়তো রাত হয়ে যাবে। পারলে থাকবেন। আর হ্যাঁ, লালটুকে বলবেন ছোটঘরটা যেন একটু ফাঁকা করে রাখে। ঠিক আছে?

ঘরে ফিরে ভালো করে দরজা বন্ধ করল অর্পিতা। আলো না নিভিয়েই শুয়ে পড়ল। চোখ বুজে হাতড়াচ্ছে স্মৃতি। একটা ভালো ছবি মনে পড়ে না। বিয়ের পর বছর দুয়েক তাও ঘরোয়া, সংসারী ছিল শুভেন্দু, কিন্তু সেই সময়টা যেন বেবাক মুছে গেছে মস্তিষ্কের কোষ থেকে। হ্যাঁ, একটা ছবি মনে আসছে।

লালটু হওয়ার পর নার্সিংহোমে একটা ফুলের তোড়া নিয়ে এসেছিল শুভেন্দু। অনেক ধরনের ফুল ছিল তোড়াটায়। গোলাপ, রজনীগন্ধা, অ্যাসটর, কলাবতী, হলুদ চন্দ্রমল্লিকা। ঘরভর্তি লোক, ফুলটা বিছানার পাশে রেখে সকলের পিছনে দাঁড়িয়ে শুভেন্দু মিটিমিটি হাসছিল।

তার কিছুদিন পর থেকেই তো স্বরূপে প্রস্ফুটিত হল শুভেন্দু। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই বেরিয়ে যায় কাজে, বাচ্চার জন্য আয়া রাখা হয়েছে... অফিসে গা ম্যাজম্যাজ করছিল অর্পিতার, হাফডে সি এল্ নিয়ে বাড়ি চলে এল.... ঘরে ঢুকতেই অভাবনীয় দৃশ্য! লালটু খাটে শুয়ে ট্যাঁ ট্যাঁ করছে, মেঝেয় বছর পঁয়ত্রিশের আয়াটার সঙ্গে আদিম খেলায় মেতেছে শুভেন্দু...! ওই ক্ষয়াটে আধবুড়ি মেয়েমানুষটার সঙ্গে টগবগে জোয়ান শুভেন্দু শুতে পারে..... অর্পিতা নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। আশ্চর্য শুভেন্দু যখন হাতে-পায়ে ধরে বলল, মেয়েটা তাকে একা ঘরে ফুঁসলেছে, সে মাথার ঠিক রাখতে পারেনি, অর্পিতা বিশ্বাসও করে নিয়েছিল! কী বোকা ছিল অর্পিতা!

তারপর থেকে ঘরে আর মেয়েমানুষ নিয়ে বেচালপনা করেনি শুভেন্দু, শুরু করল মদ গেলা। দামি বিদেশী সুরা নয়, তাড়ি চুল্লু। দিশি মদ খেয়ে পথে ঘাটে গড়াচ্ছে, লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে অর্পিতার। রেললাইনের ধারে বস্তিতে যাতায়াত শুরু হলো....। ভদ্রঘরের মেয়ে নয়, অশিক্ষিত কুলিকামিন ঝি শ্রেণীর মেয়েছেলেদের ওপর তার তীব্র আকর্ষণ।

অর্পিতা শোধরাবার চেষ্টা করেছে কত। ঝগড়া করেছে, গালিগালাজ করেছে, মার কাছে চলে গেছে, ভাসুর ননদের কাছে গিয়ে কেঁদেছে....। অর্পিতা খুব বেশি প্রতিবাদী হয়ে গেলে ক'দিন হয়তো সংযত থাকে, আবার যে কে সেই। নিজের মাইনে তো উবেই যাচ্ছে, টানাটানি করছে অর্পিতার টাকা নিয়ে.....। কত সহ্য করতে পারে অর্পিতা? কত? কত? মাসের তিন তারিখে অর্পিতার গোটা মাইনের টাকাটা লোপাট করে বাবু বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে চলে গেলেন দার্জিলিং। ফুর্তি করতে। অর্পিতার কপালে হাত। নোংরা পাড়া থেকে শুভেন্দুকে তুলে নিয়ে গেল পুলিশ, রাতদুপুরে স্বামীকে ছাড়াতে অর্পিতাকে ছুটতে হলো থানায়। আরও আছে, আরও আছে। বস্তিতে একটা চোদ্দ-পনেরো বছরের মেয়ের সঙ্গে ফস্টিনস্টি করেছিল, বস্তির ছেলেরা বাড়িতে এসে চড়াও হলো। বের করে দিন শুয়োরের বাচ্চাটাকে, ওই খানকির ছেলেকে আজ জ্যান্ত পুঁতব.....। শুভেন্দু খাটের তলায় লুকিয়ে আছে, কেন্নোর মতো....!

এর পরও শুভেন্দুর সঙ্গে বাস করেছে অর্পিতা। হয়তো ভুল করেই

করেছে। হয়তো যেদিন ওই আয়ার সঙ্গে দেখে ফেলেছিল সেদিনই শুভেন্দুকে পরিত্যাগ করা উচিত ছিলো। কেন করেনি? এক-আধটা বছর নয়, ছ'ছটা বছর ওই লম্পটটার সঙ্গে পড়ে রইল কেন?

হায় রে, সব কেনর উত্তর কি আছে পৃথিবীতে? মানুষের হৃদয় কি সব সময় যুক্তি-বুদ্ধি মেনে চলে? ভালোবাসা বড় কুৎসিত অনুভূতি, স্বাভাবিক চিন্তা শক্তিকে সে গুলিয়ে দেয়। নইলে লেখাপড়া জানা, চাকরি করা মেয়ে অর্পিতা মাদুলি তাবিজ কবজ বশীকরণকে তখন আশ্রয় বলে আঁকড়ে ধরে? কোথায় না ছুটেছে শুভেন্দুর মতি ফেরানোর জন্য! ওমুক বলল তমুক জায়গায় এক সাধু নাকি অব্যর্থ শিকড় দেয়, শুভেন্দুর বালিশের তলায় সেটা রেখে দিলেই কেল্লা ফতে। অফিস কামাই করে অর্পিতা ছুটল মধ্যমগ্রাম.....। বশীকরণ তাবিজ আনতে চম্পাহাটি, সিদ্ধ মাদুলির আশায় গুপ্তিপাড়া। সন্তোষী মার পুজো করছে, শনিমন্দিরের হত্যে দিচ্ছে.....লোকটার সঙ্গে একখাটে শুতে গা গুলিয়ে উঠত, তবু নির্লজ্জ হয়ে তাকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করেছে, বাজারের মেয়ের মতো মেলে ধরেছে নিজেকে।

মতি তো ফিরলই না, পরিণামে বুবলি এসে গেল পেটে। তারপরও দাঁতে দাঁত চেপে কী করে যে ওই লোকের সঙ্গে বসবাস করেছে? রাতবিরেতে শুভেন্দু বাড়ি ফিরলে তুমুল ঝগড়াঝাঁটি হয়, উন্মত্তের মতো শুভেন্দুকে খামচায় কামড়ায় অর্পিতা, অশ্রাব্য গালিগালাজ করে... সে এক নারকীয় অধ্যায়।

শেষে শুভেন্দুই মুক্তি দিল। বদলি নিয়ে চলে গেল রাঁচি। সেখান থেকে রানিগঞ্জ। সেখান থেকে আসানসোল। খবর রাখতে না চাইলেও কিছু কিছু উড়ো খবর তো কানে এসেছেই অর্পিতার। কুলিকামিনদের বস্তিতে গিয়ে পড়ে থাকে, ধেনো গিলে গিলে ক্যাঁকলাসের মতো চেহারা হয়েছে, অফিসও করে না নিয়মিত.....। আশ্চর্য, ছেলেমেয়ে দুটোর ওপরও এতটুকু টান ছিল না মানুষটার?

বন্ধ দরজার ওপার থেকে একটা তীক্ষ্ণ ক্রন্দন ধ্বনি শব্দ উড়ে আসছে। সরু মেয়েলি গলার কান্না। মত্ত পুরুষের গর্জনও যেন শোনা যায়। মারধোর করছে নাকি? শুভেন্দুর অবশ্য একটাই গুণ ছিল– অর্পিতার গায়ে হাত তোলেনি কখনও। অর্পিতা আক্রমণ করলে প্রতিরোধ করতো, মাতাল হয়ে অশ্লীল বাক্যের ফোয়ারা ছুটিয়েছে, তবু....।

পাশ ফিরে এক হাতে কান চাপল অর্পিতা। ওইটুকু পুণ্যের জন্যই কি

মানুষটার প্রাণ ধুকপুক করছে এখনও ? নাকি অত পাপ করেছে বলেই জীবন্মৃত হয়ে থাকার সাজা দিয়েছেন ঈশ্বর? মা বলত ইহলোকের পাপের বেতন ইহলোকেই চুকিয়ে যেতে হয়।

ওই মানুষটার সেবাশুশ্রূষা করাটাও তো শাস্তি। কোন পাপে অর্পিতা সাজা পাবে? ভালোবাসার?

।। চার ।।

বিছানা পাতাই ছিল। ছোট ঘরের তক্তপোশে। অ্যাম্বুলেন্সের লোক দুটো স্ট্রেচারে চাপিয়ে শুভেন্দুকে শুইয়ে দিয়ে গেল।

একটু আগে ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছিল শুভেন্দু। বোবা দৃষ্টি। শোওয়া মাত্রই চোখ বুজেছে। আসানসোল থেকে কলকাতা কম দূর নয়, দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে অশক্ত মানুষটা যেন আরও বেশি কাহিল এখন।

বহুকাল পরে বাড়ি ফিরে কি নিশ্চিন্ত বোধ করল শুভেন্দু? নাকি সংকোচ জেগেছে? এই মুহূর্তে অবশ্য কিছুই বোঝার উপায় নেই। শুধু তার নিশ্বাসের চঞ্চল ওঠাপড়া জানান দেয় তার ভেতরে একটা চাপা আলোড়ন চলছে।

অর্পিতাও আর পারছিল না। বসার জায়গায় পাতা বেতের চেয়ারে শরীর ছেড়ে দিয়েছে। চুল উসকো-খুসকো, মুখ যেন কালিলেপা, মাথা ছিঁড়ে পড়ছে, কোমর-পিঠে অসহ্য যন্ত্রণা। দুটো দিনও পুরো হয়নি, এর মধ্যে যেন এক জীবনের ক্লান্তি জমে গেল মস্তিষ্কে!

বুবলি-লালটু তফাতে দাঁড়িয়ে। নন্দিতাও। কারুর মুখে কোনও কথা নেই। আড়ে আড়ে দেখছে অর্পিতাকে। অমল অ্যাম্বুলেন্সটাকে ছাড়তে গিয়েছিল, ফিরে রুগীর ঘরে ঢুকেছে। বেরিয়ে একটুক্ষণ কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে রইল। তারপর অনুচ্চস্বরে জিজ্ঞেস করল,–ওখান থেকে বেরিয়েছিলে কখন?

অর্পিতা কপাল টিপল,–সাড়ে বারোটা নাগাদ।

–এতক্ষণ লাগল? প্রায় ন'ঘন্টা?

–কোনা এক্সপ্রেসওয়ের মুখটায় লরির জ্যাম ছিল খুব। ওখানেই প্রায় ঘণ্টা দুয়েক....। তার উপর গোটা রাস্তা জল কাদা বৃষ্টি....উফ্, যা গেল!

নন্দিতা এতক্ষণে কথা খুঁজে পেয়েছে। জিজ্ঞেস করল,–চা খাবি?

–কর্ একটু।

রান্নাঘরে ঢুকতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল নন্দিতা। পিছন ফিরে তাকিয়েছে। শুকনো গলায় প্রশ্ন করল,–শুভেন্দুকে এখন কি দেওয়া হবে?

–পথে হরলিক্স খেয়েছে। খানিকক্ষণ আগে। এরপর একেবার ভাত।

–ভাত খাচ্ছে?

–গলা গলা। অর্পিতার স্বর ক্লান্ত, জবাব নির্লিপ্ত,–ডাক্তার বলছিল সব্‌জি-টব্‌জি সেদ্ধও দেওয়া যেতে পারে। কিম্বা স্যুপ, স্টু.....

–ও। নন্দিতা রান্নাঘরে চলে গেল। সামান্য গলা উঠিয়ে বলল,–আমি কিন্তু ওর জন্য কিছু করিনি। কী খাবে, না খাবে.....বসিয়ে দিচ্ছি তাহলে।

অর্পিতা আর উত্তর দিল না। ফোঁস করে শ্বাস ফেলল একটা।

অমল চেয়ার টেনে বসেছে। থুতনিতে হাত রেখে বলল,–কী কনডিশান এখন?

–কথা বলার ক্ষমতা নেই। ডান হাতটাও তুলতে পারছে না। ডাক্তার বলছিল সময় লাগবে।

–তার মানে তোমার ঘাড়েই এসে পড়ল?

–আমার কপাল।

লালটু ফস করে বলে উঠল,–আমি জেঠু, পিসিদের খবর দিয়ে দিয়েছি। কাল-পরশু হয়তো আসবে ওরা।

–আমার মাথা কিনবে। অর্পিতা অস্ফুটে গজগজ করে উঠল,–সোহাগ দেখিয়ে কেটে পড়বে, দায় তো নেবে না। তাড়াহুড়ো করে খবর দেওয়ার দরকার কী ছিল?

–নাহলে তুমিই হয়তো বলতে খবর দিস্‌নি কেন! তোমার মনের কথা বুঝবো কী করে?

লালটুর গলায় স্পষ্ট অসন্তোষ। হয়তো এটাই স্বাভাবিক। লোকটা তো ছেলেমেয়ের এক ফোঁটা শ্রদ্ধাও অর্জন করতে পারেনি কোনদিন। বাবাকে নিয়ে আসার সিদ্ধান্তে তারা যে অখুশি হবে এ তো জানা কথাই। কিন্তু অর্পিতারও যে এছাড়া কোনও উপায় ছিল না এও তো লালটুর বোঝা উচিত।

অর্পিতা কিছু বলার আগে অমলের কথায় প্রসঙ্গটা ঘুরে গেল,–এখানে কোন ডাক্তারকে দেখাবে কিছু ঠিক করেছ?

–ভাবছি।

–এখন তো নিউরোলজিস্ট দরকার?

–ওখানকার ডাক্তার দুজনের নাম সাজেস্ট করে দিল। দেখি কাকে সুবিধে হয়।... ফিজিওথেরাপিস্টেরও খোঁজ করতে হবে।

–তোমাদের বাসস্ট্যান্ডের ওখানে একটা ফিজিওথেরাপির সেন্টার আছে না?

—হ্যাঁ। কাল যাবখন।

—মানথ্‌লি বন্দোবস্ত করার চেষ্টা কোরো। খরচটা কম হবে।

—শুনেছি অনেকে নাকি প্রাইভেটেও করে। তাদের চার্জও কম।....আপনার এমন কেউ চেনাজানা আছে?

অমল কপাল কুঁচকে ভাবল একটু। তারপর বলল,...দাঁড়াও দাঁড়াও....আমাদের অফিসের এক ভদ্রলোকের মার এই কিছুদিন আগে সেরিব্রাল হয়েছিল....ও'ও তো ফিজিওথেরাপি করাত...দেখি, কালই আমি....

—খরচ কনট্রোলে না রাখতে পারলে আমি অকূল পাথারে পড়ে যাব।

—সে তো বটেই।... ডাক্তার কী বলেছে? এখন ক'বার করে ম্যাসাজ?

—অন্তত দু'বার। সিচুয়েশান ইমপ্রুভ করলে তখন হয়তো ....

মনে মনে অর্পিতা বলল, হাতি পোষার খরচা। ভাবল একবার জামাইবাবুকে বলে একটি পয়সাও সঞ্চয় নেই শুভেন্দুর, এবার আমার সর্বস্ব নিংড়ে নেবে লোকটা। বলল না। থাক গে, এমনিতেই ছেলেমেয়েরা তেতে আছে, ওদের সামনে এক্ষুনি এক্ষুনি কাদা নয় নাই ঘাঁটল।

নন্দিতা চা-বিস্কুট নিয়ে এসেছে। ছোট গোলটেবিলে কাপ-প্লেট রাখতে রাখতে বলল,—তুই কাল রাত্তিরে ছিলি কোথায়?

পলকের জন্য নরকের ছবিটা চোখে ভেসে উঠল অর্পিতার। খাটের নীচে ডাঁই মদের বোতল, তোশকের তলায় নোংরা বই..... বাহান্ন বছর বয়সেও কি হীন জীবনযাপন করছিল লোকটা!

এড়ানোর ভঙ্গিতে বলল,—ছিলাম কোথাও একটা।

—এক রাত্তিরেই কী চেহারা করেছিস একবার আয়নায় গিয়ে দ্যাখ্।

—হুঁ।

—যা, উঠে মুখ-টুখ ধো, একটু ফ্রেশ হয়ে নে।

—দাঁড়া, এখন দুটো ওষুধ আছে, দিয়ে আসি আগে।

অর্পিতা ওঠার আগেই দরজায় করাঘাত। খুলতেই দোতলার কমলা ঢুকে পড়েছে,—কী হয়েছে গো শুভেন্দুবাবুর? অ্যাম্বুলেন্স করে কোত্থেকে নিয়ে এলে?

এই সময়ে খাজুরা করার উৎপাত ভালো লাগে? তবু যথাসম্ভব শান্ত মুখে শুভেন্দুর সমাচার পেশ করল অর্পিতা। শুনেই তৃপ্ত নয়, কমলা উঁকিও দিয়ে এল ছোট ঘরে। তারপর শুরু হয়েছে হাজারো রকমের প্রশ্নবাণ। উত্তর দিতে দিতে অর্পিতা জেরবার।

নন্দিতাই উদ্ধার করল। কমলাকে থামিয়ে বলে উঠল,—আমরা এবার

উঠিরে অপু। তুই এখন খুব টায়ার্ড, একটু জিরো।

অমলও দাঁড়িয়ে পড়েছে,– কাল আবার আসবখন,খোঁজখবর সব নিয়ে।..তুমি শুভেন্দুকে কী ওষুধ খাওয়াবে বলছিলে না?

ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে কমলাও আর কথা বাড়াল না। কেটে পড়েছে মানে মানে।

সবাই চলে যাওয়ার পর লালটু দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল। বুবলি গটগট করে ঢুকেছে রান্নাঘরে। প্রেশার কুকারে ভাত বসিয়ে গিয়েছিল নন্দিতা, ঢাকা খুলছে কুকারের। সশব্দে।

ছেলেমেয়ের চাপা বিরুদ্ধ ভাব টের পাচ্ছিল অর্পিতা। কখনও নৈঃশব্দ্যে, কখনও শব্দে। তবে এই মুহূর্তে ঘাঁটাল না তাদের, ভালো করে হাত ধুয়ে গেছে শুভেন্দুর কাছে। চোখ বুজেই আছে লোকটা। মাথাটা একপাশে হেলে, মুখ অল্প হাঁ, লালা গড়াচ্ছে কষ বেয়ে। ঘেন্না করে। গালময় খোঁচা খোঁচা দাড়ি। এই লোকই কি সেই লোক যে উচ্ছৃঙ্খল ভাবে চলে গেছিল একদিন?

অর্পিতা ধীর পায়ে শুভেন্দুর মাথার পাশে গেল। ডাকব না ডাকব না করেও আলতো করে ঠেলেছে,–এই যে,শুনছ? এই যে...

চোখের পাতা সামান্য খুলে গেল শুভেন্দুর। গলায় শব্দ,–অঁ অঁ অঁ অঁ....

অস্বস্তিকর আওয়াজ। গোটা রাস্তাতেই ওই আওয়াজ শুনতে হয়েছে অর্পিতাকে, তবু এখনও কানটা যেন অভ্যস্ত হয়নি।

ঘাড়ে হাত রেখে শুভেন্দুর মাথাটা তুলল আলতো করে। একটা ক্যাপসুল মুখে গুঁজে দিয়ে জল ঢালল সতর্ক ভাবে। যান্ত্রিক স্বরে বলল,–গিলে নাও।

গিলেছে। মাথাটা বালিশে নামিয়ে দিল অর্পিতা। এইটুকু পরিশ্রমেই যেন হাঁপিয়ে গেছে শুভেন্দু, দম নিচ্ছে জোরে জোরে।

বুবলির গলা শুনতে পেল অর্পিতা,–গলা ভাত কি এখন দেব?

শুভেন্দুকেই দেখতে দেখতে অর্পিতা সরে আসছিল, থমকে গেল। আবার গঁ গঁ করছে শুভেন্দু।

অর্পিতা ভুরু কোঁচকাল, কী?

–অঁ অঁ অঁ অঁ...

–কী বলছ? কী চাই?

নিষ্প্রাণ চোখ দুটো অধীর সহসা। গলায় শব্দটা ধরে রেখেই বাঁ হাত তুলেছে শুভেন্দু। কী দেখায়? চায়টাই বা কী? অর্পিতা ওখানে বসে থাকুক? নাকি বুবলি-লালটুকে দেখতে চাইছে? ছেলেমেয়ে একটি বারের তরেও সামনে

আসেনি, সেই জন্যেই কি চাঞ্চল্য?

অর্পিতা আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ল,– লালটু-বুবলি পরে আসবে। এখন শুয়ে থাকো। চুপচাপ।

উৎকট গোঙানি থেমে গেল। উত্তেজিত হাতখানাও ঝপ করে নেমে গেছে। চোখ বন্ধ করেছে লোকটা।

কী মানুষের কী যে হাল হয়! বিকৃত কামণার তাড়ণায় কোনওদিন ছেলেমেয়েকে স্মরণ পর্যন্ত করেনি, আজ গাড্ডায় পড়ে....! হাসিও পায়।

বেরিয়ে এসে অর্পিতা বুবলিকে বলল,–প্লেটে দু-হাতা ভাত বাড়। জুড়োক। খাওয়াতে সময় লাগবে, আগে আমরা সেরে নিই।

বুবলি সাড়াশব্দ করল না। ফের ঘটাং ঘটাং বাসন বাজাচ্ছে। পাথর মুখে টিভি দেখছে লালটু, এক্কেবারে জিরো ভলিউমে।

অর্পিতা ঘরে গিয়ে শাড়ি-জামা বদলাল আগে। বাথরুমে ঢুকে দেখল আজ চৌবাচ্চায় জল টলটল। পাম্প সারানো হয়ে গেল? নাকি ভারী দিয়ে জল নেওয়া হয়েছে? জলে হাত ছোঁয়াল একবার। আহ্, কী ঠাণ্ডা! গায়ে একটু ঢাললে হয়। সেই কাল দুপুর থেকে এত ক্লেদ জমেছে শরীরে! থাক, রাত হলো, ছেলেমেয়ে দুটো না খেয়ে বসে আছে, বরং শোওয়ার আগে ভালো করে ধুয়ে নেবে দেহটাকে। তাছাড়া এতক্ষণ খিদে-তেষ্টারও বোধ ছিল না, এবার উদরও হাঁকাহাঁকি শুরু করেছে।

ঘাড়ে-মুখে খানিকটা জল দিয়ে অর্পিতা সটান খাবার টেবিলে। থালা সাজিয়ে বসে ছিল ছেলেমেয়ে, তারই অপেক্ষায়। অপাঙ্গে দেখল দুজনকে। পরিবেশ সহজ করার জন্য জোর করে একটু উচ্ছল হলো, বলল,কে রাঁধল আজ? দিদি ? না গণেশের মা?

–মাসিমণি। বুবলির সংক্ষিপ্ত জবাব।

– তোদের কোনও অসুবিধা হয়নি নিশ্চয়ই?

উত্তর নেই।

–ইলেকট্রিকের মিস্ত্রি এসেছিল আজ? ছোটো ঘরের রেগুলেটার ঠিক হয়েছে?

–হুঁ। লালটু চোখ তুলেই নামিয়ে নিল,–আমি কোন ঘরে শোব?

–ছোট ঘরে কি শুতে পারবি তুই? রাত্তিরে বার বার উঠতে হবে। বেডপ্যান দেওয়া, জল-টল খাওয়ানো.....

–ওসব কি আমার ভাবার কথা?

–নিয়ে আসার আগে তোমার চিন্তা করা উচিত ছিল।

নন্দিতা মুরগি রান্না করে রেখে গেছে। রুটির টুকরো ঝোলে ডোবাতে ডোবাতে শান্ত মুখে ছেলেমেয়ের উষ্মা হজম করল অর্পিতা। ভাবলেশহীন মুখে বলল,– তখন থেকে দেখছি তোরা দুজনে হাঁড়িমুখ করে আছিস। কেন ?

লালটু গুমগুমে গলায় বলল,–এ প্রশ্নের কোনও মানেই হয় না।

–অবশ্যই হয়। অর্পিতা মুখ তুলল,– তোরা কেউ আর ছোটটি নোস্। তোদের সঙ্গে খোলাখুলি কথা হওয়াই ভালো।..... তোর বাবার সঙ্গে আমার বনিবনা ছিল না, সে আলাদা থাকত। আমার উপর সে একসময়ে অনেক অত্যাচার করেছে, তার কিছুটা তোরা জানিসও। বাবা হিসেবে ওই লোকটা কোনও কর্তব্য পালন করেনি, যেমন ভাবে খুশি জীবন কাটিয়েছে, এসবও তোদের অজানা নয়। মানুষটা তোদের থেকে এতদূরে ছিল, ওকে বাবা বলে ভাবাটাই হয়তো....। তা সত্ত্বেও একটা কথা বলি। লোকটা আজ চরম বিপাকে পড়েছে. আমরা ছাড়া তাকে দেখার আর কেউ নেই। আত্মীয়তা, বন্ধন, সম্পর্ক, এসব নাই থাক, মানবিকতা বলেও তো একটা কথা আছে। আমি ওকে ফেলে দিই কী করে? তোরা তো আমায় এত কাল ধরে দেখছিস, যেচে আমি কোনওদিন লোকটার সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছি, বল্?

–সে তোমার ব্যাপার মা। তোমার দয়ার প্রাণ, তুমি দয়া দেখাতে পার। লালটু মাকে থামিয়ে দিল,–কিন্তু আমরা তাকে দেখে আনন্দে নেচে উঠব, এটা ভাবলে কী করে?

বুবলি ঝুপ করে বলে উঠল,–আমরা তো আদৌ বুঝতে পারছি না, তুমি শুনেই দৌড়ে গেলে কেন?

–লোকটা মরণাপন্ন শুনেও হাত গুটিয়ে বসে থাকব?

–কেন থাকবে না? ও আমাদের কে?

কথাটা তিরের মতো বিঁধল অর্পিতার বুকে। মেয়েদের নাকি বাবার ওপর চোরা দুর্বলতা থাকে! শত দোষ করলেও বাবার নাকি একটা আলাদা স্থান থাকে মেয়েদের মনে! ইচ্ছে হচ্ছে এক্ষুনি শুভেন্দুকে ঘাড় ধরে তুলে এনে দেখায় মেয়ের ঘৃণার পরিমাণটাকে। দেখুক, কোন স্তরে সে নেমে গিয়েছিল!

আবেগটাকে প্রশয় দিল না অর্পিতা। বাবাকে এত ঘেন্নার চোখে দেখাও ছেলেমেয়েদের পক্ষে মঙ্গলজনক নয়। এ থেকে তাদের মনেই নানান জটিলতার সৃষ্টি হয়ে যায়। বুবলি-লালটুকে সে আদর দিয়েছে ঠিকই, একাই প্রাণপাত করেছে, কিন্তু কখনই সজ্ঞানে শুভেন্দুর নিন্দেমন্দ করে বাবার ওপর তাদের মন

বিষিয়ে দিতে চায়নি। বাবা-মাকে ভালোবাসতে না পারাটা ছেলেমেয়ের পক্ষে কম যন্ত্রণার?

অর্পিতা শক্ত গলায় বলল,– ছি বুবলি, ওভাবে কথা বলে না। মানুষটা তোমার বাবা।

–আমি মানি না।

–না মানলেও তোমার বাবা। আমার সঙ্গে সম্পর্ক তার থাকুক চাই না থাকুক, তোমাদের সঙ্গে তার রিলেশানটা তোমরা কোনও ভাবেই অস্বীকার করতে পার না। আজ যদি সে মরেও যেত, তার শেষ কাজটা তোমাদেরই গিয়ে কিন্তু করতে হতো।

বুবলি আচমকা ফুঁপিয়ে উঠেছে। নাক টানছে। টসটস করে জল পড়ছে চোখ দিয়ে। লালটু মুখ গোঁজ করে বসে, খাচ্ছে না।

অর্পিতার বুকটা ব্যথিয়ে উঠল। আহা রে, কী তীব্র অভিমান যে জমে আছে ছেলেমেয়েদুটোর মনে! তিন বছর বয়সের পর থেকে বাবাকে তো সেভাবে দেখেই নি বুবলি, লালটুর কাছেও বাবার যে স্মৃতি আছে তা মোটেই সুখকর নয়। নাঃ, বরফ গলতে সময় লাগবে ঢের।

অর্পিতা মেয়ের মাথায় হাত রাখল,–শান্ত হ।...ঠিক আছে, মনে কর না এমনি একটা লোক অসুস্থ হয়ে পড়েছে, তাকে আমরা আমাদের কাছে এনে রেখেছি। একটু মানিয়ে গুনিয়ে নিতে পারবি না?

লালটু টেরিয়ে একবার বোনকে দেখল, একবার মাকে। ভার গলায় বলল, –ভালো হলে চলে যাবে তো? এখানে গেঁড়ে বসবে না তো?

–ভালো হতে দে।..যাক গে, খেয়ে উঠে শোওয়ার অ্যারেঞ্জমেন্টগুলো করে ফ্যাল। বড় ঘরের ডিভানটায় তুই বিছানা করে নে, বোন বিছানায় শুক। আর আমায় একটা তোশক বার করে দে, ছোট ঘরের মেঝেয় পেতে নেব।

–তোমার ঠাণ্ডা লাগবে না?

–ধুস, গরমকাল তো। মেঝেয় শুয়েই আরাম বেশি।

লালটু-বুবলি আর তর্ক করল না। নিঃশব্দে খাচ্ছে।

আঁচিয়ে উঠে গলাভাতের থালা নিয়ে অর্পিতা ফের ছোট ঘরে। শুভেন্দু এবার সত্যি সত্যি ঘুমিয়ে পড়েছে, ডেকে ডেকেও তোলা যাচ্ছে না, ঠেলতে হলো বার কয়েক। অস্বচ্ছ চোখে আবার সেই ভাষাহীন দৃষ্টি। নুনবিহীন বিস্বাদ ফ্যানভাত চামচে করে খাইয়ে দিচ্ছে অর্পিতা, তামসিক রুচির শুভেন্দু বুভুক্ষুর মতো তাই গিলছে। শুয়ে শুয়েই। নির্ঘাৎ খুব খিদে পেয়েছিল, দু'মিনিটেই প্লেট

সাফ।

অর্পিতা নরম গলায় জিজ্ঞাসা করল,–আর খাবে?

অস্পষ্ট ভাবে মাথা নাড়ল লোকটা। চোখ পিটপিট করছে।

–পেট ভরেছে?

–অঁ অঁ অঁ।

নিপুণ সেবিকার মতো শুভেন্দুর মুখ মুছিয়ে দিল অর্পিতা। জল দিল সামান্য। রাতের একটা ওষুধও। বলল, –এবার ঘুমোও।

থালা হাতে নিয়ে অর্পিতা উঠতে যাবে, বাঁ হাতে খপ করে অর্পিতার হাত চেপে ধরেছে শুভেন্দু।

–আবার কী হলো?

শুভেন্দুর প্রায় অবশ মুখে হঠাৎই ভাঙচুর। চোখ ভর্তি হয়ে গেছে জলে। গোঙানিটা যেন কান্নার মতো হয়ে গেল। বাঁ হাত কেমন বিচিত্র ভঙ্গিতে ছুঁইয়েছে কপালে।

ক্ষমা চাইছে! ক্ষমা চাইছে!

বাইরে সহসা ঝমঝম বৃষ্টি। অর্পিতার বুকের গভীরেও ভেজা বাতাস। বর্ষা নেমেছে।

।। পাঁচ ।।

ভাদ্রমাসের মাঝামাঝি বিদায় নিল বর্ষা।

এ বছল আকাশ খেল দেখিয়েছে খুব। পর্জন্যদেব টানা দেড় মাস কুপিত হয়ে রইলেন, সূর্যদেবকে ভালো করে পৃথিবী দেখার সুযোগ দিলেন না। সারক্ষণই চরাচরে ঘনঘোর, হয় ঝিরঝির ঝরছে, নয়তো নামছে মুষলধারায়। মাঝে সাত আটটা দিন তো কলকাতায় জল থৈ থৈ দশা। স্কুল-কলেজে রেনি ডে, পথে প্রায় যানবাহন নেইই, অফিস যাত্রীরা চূড়ান্ত নাকাল।

অর্পিতারও কম হয়রানি গেল না। একে ঘরে প্রায় অথর্ব রুগী, তার পরিচর্যা করো, নিয়মিত ম্যাসাজ করাও, ঘড়ির কাঁটা ধরে ওষুধ খাওয়াও, তার সঙ্গে জলকাদা ঠেঙিয়ে ডাক্তারের কাছে ছোটো, অফিস দৌড়োও.....। প্রথমটা দিন দশেকের ছুটি নিয়ে নিয়েছিল অর্পিতা, একা হাতে সামলাচ্ছিল সবদিক। কিন্তু এ অসুখ তো দু-দশদিনে সারার নয়, পুরো স্বাভাবিক হতে শুভেন্দুর দীর্ঘ সময় লেগে যাবে, তদ্দিন বাড়ি বসে থাকলে অর্পিতার চলে? তাই মরিয়া হয়ে একটা আয়া রেখে দিল, দিনের বেলার জন্য। মনটা খুঁতখুঁত করছিল, শুভেন্দুর অতীত ইতিহাস যা, তাতে আয়া রাখা মানে তো বিপদ ডেকে আনা। তবু

উপায় কী? অবশ্য শুভেন্দু এখন নখদন্তহীন, এটাই ভরসা।

তা মাত্র দু-আড়াই মাসে শুভেন্দুর ভালোই উন্নতি হয়েছে। সেরিব্রাল অ্যাটাকের প্রথম ঝটকাটা তাকে আছড়ে ফেলেছিল, তবে তার বাঁচার আকাঙ্ক্ষাটা বোধহয় আরও প্রবল, অত্যন্ত দ্রুত আরোগ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে সে। ওষুধ আর ফিজিওথেরাপির গুণে মাসখানেকের মধ্যে ডান অঙ্গে সাড় ফিরে এল, বুলিও এসে গেল মুখে। এখন সে ঘরের মধ্যে সামান্য হাঁটাচলা শুরু করেছে। ডান পায়ে পুরোপুরি জোর পায় না অবশ্য, চলতে গেলে এখনও তাকে কারুর না কারুর সাহায্য নিতে হয়। লাঠি দিয়ে হাঁটার চেষ্টা করলে টলমল করে।

বুবলি-লালটু প্রথম কটা দিন বাবার থেকে দূরে দূরেই ছিল। বড় জোর ছোটঘরের দরজায় উঁকিঝুঁকি দিল এক-আধবার ব্যস, পারতপক্ষে কাছে ঘেঁসত না। এক যুগের রাগ-অভিমান কি চট করে মোছে?

একটু একটু করে বদলাল পরিস্থিতি। একদিন রাতে অর্পিতা রান্নাঘরে রুটি করছিল, বসার জায়গাতেই বইখাতা উল্টোছিল লালটু, হঠাৎ ছোট ঘরে চাপা আর্তনাদ। অর্পিতা শুনতে পায়নি, ভুরু কুঁচকে লালটুই উঠে গিয়েছিল অগত্যা। গিয়ে দেখে বিশ্রী কাণ্ড, তক্তপোশ থেকে অর্ধেক ঝুলছে শুভেন্দু। ডান দিক তখনও নাড়াচড়া করতে পারে না, বাঁ হাতে কোনওরকমে খামচে ধরে আছে বিছানা। শুভেন্দুকে তুলে স্বস্থানে ফিরিয়ে দিয়েছিল লালটু। মুখে সেদিন খানিক গজগজ করেছিল বটে, কিন্তু স্পর্শেই যেন তার খানিকটা মায়া জন্মে গেল। তারপর থেকে পড়তে বসুক, কি টিভিই দেখুক, লালটুর কান সদাই সজাগ থাকে যেন, মৃদু শব্দ হলেই ছুটে যায় ঘরটায়। কখনও মনে হয় বাবা উঠে বসতে চাইছে, বালিশ জড়ো করে তাকে আধবসা মতো করে দেয়, চোখ কুঁচকে জরিপ করে আরো কিছু বলতে চায় কিনা লোকটা। যেচে ওষুধপত্তর এনে দিচ্ছে শুভেন্দুর, ফিজিওথেরাপিস্টের সঙ্গে কথা বলছে .....। যেদিন প্রথম শুভেন্দুকে হাঁটানো হলো, লালটুই নড়া চেপে ধরে রেখেছিল বাবার।

দাদার দেখাদেখি বুবলিও এখন শুভেন্দুর উপর মোটামুটি সদয়। সে জ্ঞানত বাবাকে দেখেই নি, শুভেন্দু ছিল তার চোখে প্রায় এক অচেনা গ্রহের প্রাণী। রাগ, দুঃখ অভিমান ছিল, তবে তার চেয়েও বেশি ছিল বুঝি অপরিচয়ের আড়ষ্টতা। একসঙ্গে থাকতে থাকতে এমনিই জড়তা খানিকটা খসে যায়, ক্রমশ লোকটার উপর কৌতূহল জেগে উঠছিল বুবলির। মাঝে মাঝে লোকটার পাশে গিয়ে বসে থাকে, কখনও কখনও ওষুধ খাইয়ে দেয়। শুভেন্দু তার মুখের পানে এক অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে থাকে। দৃষ্টিটাও বুবলি উপভোগ করে যেন। একদিন

আয়া ডুব মারল, অর্পিতার মাথায় হাত,আবার একদিন কামাই হবে.....? বুবলিই অভয় দিল, তুমি ঘুরে এসো না মা, আমি একটা দিন ঠিক সামলে দেব!

সামলেওছে। দক্ষ নার্সের মতন খাইয়েছে দাইয়েছে, চোখে চোখে রেখেছে.....। অর্পিতা যখন অফিস থেকে ফিরল তখন তো, রীতিমতো গল্প করছে বাবার সঙ্গে। নিজেই বলছে বেশি, শুভেন্দু শুনছে হাসি হাসি মুখে।

ছেলেমেয়ের এটুকু পরিবর্তনে অর্পিতা খুশিই। কিম্বা বলা যায় সে অনেকটাই স্বস্তি পেয়েছে। বুবলি-লালটু পুরোপুরি অসহযোগিতা করে গেলে শুভেন্দুর সেবা করা অর্পিতার পক্ষেও কঠিন হতো।

তবে শুধু বুবলি-লালটুই কি বদলেছে, অর্পিতার কোনও বদল ঘটেনি? শুভেন্দুর উপর অর্পিতার সেই তীব্র বিরাগ এখন আর কোথায়? মানুষটা এখন একেবারে পরাজিত বিধ্বস্ত, যাকে বলে জীবন্ত ধ্বংসস্তূপ, প্রতিমুহূর্তে অসহায়ের মতো অর্পিতাকে আঁকড়ে ধরতে চাইছে, এমন অবস্থায় কাঁহাতক আর পুরনো ঘৃণাটাকে জিইয়ে রাখা যায়? উলটে যেন ভালোবাসার মরা খাতে একটু একটু করে প্রাণের সঞ্চার হচ্ছে। অর্পিতার অজান্তেই। লোকটা যখন হঠাৎ হঠাৎ তার হাত চেপে ধরে, গভীর চোখে তাকিয়ে থাকে, শিরশির করে ওঠে গা। অর্পিতা টের পায় শুভেন্দু আবার নতুন করে তাপ ছড়িয়ে দিচ্ছে তার অস্তিত্বে। কান্না পায় অর্পিতার। এইটুকু উষ্ণতার জন্য অর্পিতা একদিন কী কাঙালপনাই না করেছে! সেই চেতনা কী ফিরল শুভেন্দুর? এত দেরি করে ফিরল!

আজও শুভেন্দুর কথাই ভাবছিল অর্পিতা। অফিসে বসে। অবশ্য ভালোবাসার কথা নয়, কেজো চিন্তা। শুভেন্দুকে কলকাতায় নিয়ে আসার দিন পনেরো পর আসানসোলে রথীনকে ফোন করেছিল অর্পিতা। শুভেন্দু মাইনেকড়ি পাবে কিনা, পেলে কীভাবে টাকাটা তোলা যেতে পারে, এসব ব্যাপারে। রথীনের পরামর্শ মতোই অথরাইজেশান লেটার পাঠিয়ে দিয়েছিল, সঙ্গে শুভেন্দুর ছুটির দরখাস্তও। জলের মতো পয়সা খরচ হয়ে যাচ্ছে, বৈষয়িক দিকটাও তো একটু ভাবতে হয়। তা ব্যবস্থা হয়েছে। পর পর দু'মাস মানি অর্ডার করে টাকাও পাঠিয়ে দিয়েছে রথীন। এবার মাইনের সঙ্গে রথীন চিরকুট পাঠিয়েছে, অতি অবশ্যই যেন এ মাসে একটা মেডিকেল সার্টিফিকেট পাঠানো হয়। আজ-কালের মধ্যে একবার ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথা বলতে হবে, দরকার হলে কলও দিতে হবে একটা। শুধু সার্টিফিকেট চাওয়া নয়, ফিজিওথেরাপি এখন দু'বেলা চলছে, কমিয়ে একবার করা যায় কিনা তাও তো জানা প্রয়োজন। সার্টিফিকেটটা কি ক্যুরিয়ারে পাঠাবে? না নিজেই গিয়ে দিয়ে আসবে অর্পিতা? শুভেন্দুর অফিসে

একবার সরাসরি কথা বলে আসতে পারলে ভালো হয়।

সাড়ে চারটা বাজে। অফিসের সর্বত্রই একটা চেয়ার ছাড়ি চেয়ার ছাড়ি ভাব। মালবিকা অতনুদের সঙ্গে গুলতানি করছে, মুখ-টুক ধুয়ে এসে ব্যাগে ম্যাগাজিন ভরছে শিখা, শেষ দফার চায়ের কাপ তুলে নিয়ে যাচ্ছে সন্তোষ, তুড়ি মেরে দীপঙ্কর হাই তুলল একটা। দেবনাথের টেবিলে বসে কথা বলছিল কমলেশ, কী মনে করে অর্পিতার সামনে এল।

স্মিত মুখে বলল, –কী ম্যাডাম, হোমফ্রন্টের কী খবর ?

অর্পিতার স্বামী অসুস্থ হয়ে ফিরে এসেছে, অর্পিতার কাছেই আছে, এ খবর অফিসে গোপন নেই। অর্পিতা যেচে বলে বেড়ায়নি, তবে ছুটিটা নেওয়ার জন্য যেটুকু জানানোর সেটুকু তো জানিয়েছে। শুভেন্দুকে নিয়ে অফিসের সকলেরই একটা চোরা কৌতূহল এখন, অর্পিতা বেশ টের পায়। কমলেশ ব্যানার্জিও তার ব্যতিক্রম নয়।

অর্পিতা আলগা ভাবে বলল,–খবর আর কী, চলছে যেমন চলার।

–মিস্টার কেমন আছেন?

–বেটার।

–হাঁটাচলা করছেন?

–ওই একরকম। এখনও সময় লাগবে।

–যাক্, ক্রাইসিসটা কেটে গেছে এটাই বাঁচোয়া। কমলেশ চেয়ার টেনে বসল। হাসিটাকে চওড়া করে বলল,–আমি সত্যিই আপনাকে অ্যাডমায়ার করি ম্যাডাম।

–অ্যাডমায়ার? আমাকে? কেন?

–আপনি আপনার হাজব্যান্ডের জন্য যে লড়াইটা করলেন, সমস্ত পাস্ট ভুলে গিয়ে...আমি তো আমার মিসেসকে সর্বদা বলি, আপনি হচ্ছেন নারী জাতির আদর্শ। আপনার মহানুভবতার কোনও তুলনা হয় না।

–হুঁ, তা তো বটেই। শিখা বুঝি কান খাড়া করে শুনছিল, পুট করে বলে উঠেছে,–এমন বউ হলেই তো পুরুষমানুষের সুবিধে হয়, তাই না ?

–আহা, মানুষই তো ভুল করেই। তা বলে তাকে শোধরানোর সুযোগ দেওয়া হবে না?

–হুঁহ্, দায় পড়ে রায় মশাই। শিখা ঠোঁট উল্টোল। চোখ পাকিয়ে অর্পিতাকে বলল,–শোন অর্পিতা, পুরুষমানুষ হলো কুকুরের জাত। লাই দিলে মাথায় চড়বে।....একবার যখন পায়ে এসে পড়েছে, লাগামটা কষে ধরে রাখবি, ছাড়বি

না একদম।

পুরুষজাতির সঙ্গে কুকুরের উপমাটা হজম করতে কষ্ট হলো কমলেশের। তবু মুখে হাসি ধরে রেখেই বলল,–শিখা দিদিমিণি কিন্তু খুব ভুল বলেনি ম্যাডাম। লোহা গরম থাকতে থাকতে একটা পাক্কা বন্দোবস্ত করে ফেলুন। হাজব্যান্ডকে দিয়েএকখানা প্রেয়ার ঠুকিয়ে দিন আসানসোল অফিসে। ওদের তো কলকাতাতেই হেডঅফিস, যদি এই মওকায় ট্রান্সফর নিয়ে কলকাতায় চলে আসতে পারেন.....

অর্পিতার ভালো লাগছিল না আলোচনাটা। উপযাচক হয়ে উপদেশ বর্ষণের অছিলায় তাকে নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করাটা একটুও পছন্দ নয় তার। তবে হ্যাঁ, তারও মনে ওরকম একটা চিন্তা ঘুরছে বটে। অবশ্য সে নিজে থেকে শুভেন্দুকে কিছু বলবে না, যদি শুভেন্দু প্রসঙ্গটা উত্থাপন করে তখন নয় রথীনের সঙ্গে কথা বলা যেতে পারে। শুভেন্দুর এই পরিবর্তন সাময়িক কিনা সেটাও তো বুঝতে হবে।

শুকনো হেসে অর্পিতা বলল,–ওসব কথা বাদ দিন। কাজের কথা বলুন। এরিয়ারের টাকাটা কি পুজোর আগে পাচ্ছি?

–রেডি-রেকনার তো সবে হাতে এল। তবে বিল-টিল শুরু করে দিলে পুজোর আগে না পাওয়ার তো কোনও কারণ দেখি না।

–পুজোর তো আর মাত্র এক মাস বাকি। শিখা ফের কথা ভাসাল,–এর মধ্যে কি আর বিল হয়ে উঠবে?

–না হওয়ার কী আছে? এ অফিসে অনেকেরই তো তেমন কাজ থাকে না, তাঁরা যদি নিজেদের ইন্টারস্টেই হাতে হাত লাগান...

এবার ঠেসটা শিখার দিকে। চাকরিতে শিখা প্রায় অর্পিতারই সমসাময়িক। বহুকাল ধরে তাকে দেখছে অর্পিতা, কাজকর্ম কোনওদিনই সে বিশেষ কিছু একটা করতে চায় না। সারাক্ষণ তার মুখের সামনে ম্যাগাজিন, হয় রূপচর্চা, নয় রান্নার রেসিপি। আর শীতকালে উলকাঁটা। শিখার স্বামী-ছেলের সোয়েটার প্রাপ্তির ভাগ্য খুব ভালো। খরখর করে সহকর্মীদের কথা শোনাতেও শিখা দড় বেশ।

শিখার প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করেই কমলেশ নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, –আপনার সেই জমি কেনা কদ্দুর?

–দাঁড়ান। টাকাপয়সা হাতে পাই।.... তবে একটু দোটানাতে পড়ে গেছি।

–কীসের দোটানা?

–প্রচুর খরচপাতি গেল তো। সামনে আরও আছে....

–জমিটা বায়না করেননি এখনও?

–নাঃ। কী করি ভাবছি। অনেক খরচা হয়ে গেল.....

–যদি না নেন, আমাকে অন্তত একবার বলবেন। আমার মেজো ভায়রা একটা জমি খুঁজছিল। মোটামুটি ওইরকমই বাজেট।

–হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। ছেড়ে দিলে বলবো।

কমলেশ উঠে পড়ল। এই কথাটাই কি বলতে এসেছিল কমলেশ ব্যানার্জি? তার আগে রীতিমাফিক কৌতূহলটা দেখিয়ে নিল? অর্পিতা ঠিক বুঝতে পারল না। জমিটার ব্যাপারে পরশুদিনও জিজ্ঞেস করছিল দিদি, সে নেবে কিনা. তার পক্ষে আদৌ এখন নেওয়া সম্ভব কিনা....। ভাবার আছে, সত্যিই এখন ব্যাপারটা নিয়ে ভাবার আছে।

বাড়ি ফেরার পথেও মনে মনে হিসাব কষছিল অর্পিতা। এরিয়ার মোটামুটি হাজার পঞ্চান্ন মতোন হচ্ছে, তার থেকে কিছু পি এফে চলে যাবে.... তাহলে হয়তো হাতে পঞ্চাশের কাছাকাছি .....বাকি পঞ্চাশ জোগাড় হবে কোত্থেকে? শুভেন্দুর মাইনে হাতে আসছে ঠিকই, তবে খরচও তো কম হচ্ছে না। ফিজিওথেরাপির পিছনে দিনে একশো একশো দুশো....মাস দেড়েক ধরে অবশ্য একটু কম নিচ্ছে, তাও মাসে প্রায় সাড়ে চার হাজার। এর সঙ্গে আয়া ধরলে ছয়। তাছাড়াও ওষুধ ইঞ্জেকশান.....। শুভেন্দু এখন তো লাঠি ধরে ধরে বাথরুম অবধি যেতে পারে, এবার বোধহয় আয়াকে ছাঁটাই করে দেওয়াই যায়। শুভেন্দুও মনে হয় খরচপাতির কথাটা চিন্তা করছে। পরশু নিজেই বলছিল আয়াকে অফ্ করে দেওয়ার কথা। ভূতের মুখে রামনাম! ভাবা যায়?

বাস থেকে নেমে টুকটাক বাজার সারল অর্পিতা। কাচাকুচি বেশি হচ্ছে, গুঁড়ো সাবান শেষ, ছোট এক প্যাকেট সাবান কিনল। সঙ্গে বিস্কুট, একটা হরলিক্স। বালিগঞ্জ স্টেশনের কাছ থেকে শুভেন্দুর জন্য ফলও কিনল কিছু। মুসুম্বি, কলা, আপেল। একসময় আপেল ছুঁতো না শুভেন্দু, এখন সেদ্ধ আপেল সোনামুখ করে খেয়ে নেয়। বাড়ি ঢোকার আগে পাড়ার দোকান থেকে কয়েকটা সিঙাড়াও নিয়ে নিল। লালটু-বুবলি খাবে। নিজেরও বড্ড খিদে পেয়েছে।

সদর দরজা খোলা। গলিতে আলো এসে পড়েছে। বুবলি ছাড়াও আর একটা মহিলা-কণ্ঠ কানে এল অর্পিতার। ভেতরে ঢুকে দেখল শুভেন্দুর বোন আবির্ভূতা। সুমিতা। বসার জায়গায় ছোট্ট একটা হট্টমেলা। শুভেন্দুও সেখানে উপস্থিত। বেতের সোফায় হেলান দিয়ে বসে।

অর্পিতা ননদকে জিজ্ঞেস করল,–কখন এলে?

–অনেকক্ষণ। সেই তিনটের সময়। তোমার জন্য বসে বসে চলেই যাচ্ছিলাম, ছোড়দা জোর করে আটকে রাখল।

–ভালোই করেছে। তোমার দর্শন তাও মিলল।

–আহা, আমি বুঝি আসি না? গত রোববারের আগের রোববারই তো এসেছিলাম, তোমার নন্‌দাইকে সঙ্গে নিয়ে।

শ্লেষটা বিঁধেছে বলে অর্পিতা খুশিই হল। সুমিতাকে তার মোটেই পছন্দ নয়। বয়স তো মেঘে মেঘে কম হল না, অর্পিতার চেয়ে বড় জোর এক-আধ বছরের ছোট, এখনও এমন কচি কচি হাবভাব! বর চাকরি করে মোটর ভেহিকেল্‌সে। সে এক বাস্তুঘুঘু, দু'হাত্তা কামায়, কিন্তু কোনও আত্মীয়স্বজনের কোনও উপকারে লাগে না, অথচ বরের চুরির টাকায় বউয়ের দেমাক খুব।

অর্পিতা ভদ্রতা করে বলল,–চা টা খেয়েছ?

–শুধু চা কী গো! আমাদের বুবলি তো ওস্তাদ হয়ে গেছে, আমাকে লুচি ভেজে খাওয়াল।

–মোটেই আমি একা করিনি। আয়ামাসি আমায় হেলপ্‌ করেছে।

শুভেন্দু বলল,–বুবলি, এবার চটপট তোমার মাকেও চা করে দাও।..... সুমি, তুইও এককাপ খা।

ফল, সিঙাড়ার ঠোঙা বুবলির হাতে ধরিয়ে দিল অর্পিতা। আয়া মহিলাটির এখন কোনও কাজ নেই, সে সঙ্গে সঙ্গে প্লেট এনে সিঙাড়া ঢেলে দিল। লালটু বড় ঘরে ছিল, বেরিয়ে এসে ছোঁ মেরে একখানা সিঙাড়া তুলে নিয়েছে। কামড় মেরেই গরমে আহাহা করে উঠল।

দেখে সুমিতার কী হাসি! শুভেন্দুও হাসছে মুখ টিপে।

ফস্‌ করে সুমিতা বলল,–লালটুটা একদম ছোড়দার নেচার পেয়েছে, না বউদি? কচুরি- সিঙাড়া দেখলেই হামলে পড়া, আর সেই মুখ নিয়েই উরি বাবারি উরি বাবারি?

ছোড়দার নেচার! কথাটা ঠং করে বাজল কানে। মুখে কিছু না বলে ব্যাগ রাখতে ঘরে চলে গেল অর্পিতা। বাথরুম ঘুরে এসে বসল আবার।

নিরুত্তাপ স্বরে প্রশ্ন করল,–তোমাদের ছেলের কী খবর ?

–খুব আদাজল খেয়ে লেগেছে। কিছুতেই জেনারেল লাইনে পড়বে না, এখন থেকেই জয়েন্টের জন্য তৈরি হচ্ছে। ওর বাবার ইচ্ছে রানা কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং-এর লাইনে যাক।

শুভেন্দু বলল,– কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং-এ চান্স পাওয়া কিন্তু খুব কঠিন।

–এখানে না পেলে ব্যাঙ্গালোরে চেষ্টা করব। ব্যাঙ্গালোরে তো শুনি প্রচুর সিট।

–সে তো অনেক টাকার ধাক্কা রে।

–ছেলের ফিউচারের জন্য খরচ তো কিছু করতেই হবে ছোড়দা। এমনি লাইনে পড়া মানে তো পরকাল ঝরঝরে। বলেই লালটুর দিকে ফিরেছে সুমিতা, –অবশ্য আমাদের লালটুর খুব মাথা,ও কেমিস্ট্রি অনার্স নিয়ে পড়ছে, নিশ্চয়ই এম এস সি করবে.....ও ঠিক সাইন করে যাবে দেখো। বড়দা সব সময়ে বলে লালটু আমাদের বংশের মুখ উজ্জ্বল করবে।

ফের সেই ঢঙের কথাবার্তা! বংশ! হাড় কালি করে ছেলে মানুষ করছে অর্পিতা, গর্বে চাঁদি ফাটে সেন বংশের!

আরও খানিকক্ষন বকর বকর করে উঠে পড়ল সুমিতা। দাদার গায়ে মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলল,–খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যাও ছোড়দা। তারপর একদিন আমার বাড়িতে নিয়ে যাব। দেখবে কী সুন্দর একটা গোলাপ বাগান করেছি। লাল গোলাপ, গোলাপি গোলাপ, ব্ল্যাক প্রিন্স.....

–এক্ষুনি এক্ষুনি কী আর যেতে পারব? শুভেন্দু হালকা শ্বাস ফেলল, তুইই বরং আয় মাঝে মাঝে।

–নিদেনপক্ষে খবরটুকু নিও। অর্পিতা ফের ছোট করে হুল ফোটাল, –তাতেও তোমার ছোড়দার ভালো লাগবে।

–যদ্দূর সাধ্য চেষ্টা তো করছি বউদি। জানোই তো, তোমার ননদাই কেমন ব্যস্ত মানুষ, নটা-দশটার আগে অফিস থেকে ফিরতে পারে না।.....আমার সংসারটি তো আপনি-কোপনি নয়। শ্বশুর শাশুড়ি পিসী শাশুড়ি..... সবার মর্জিমেজাজ সামলে-সুমলে তবে আমার আসা। সুমিতা মাথা দোলাচ্ছে, — তোমরা একটা ফোন নিয়ে নিলেই আর ঝামেলা থাকে না। রোজই ছোড়দার খবর নিতে পারি।

–আমার এত ক্ষমতা নেই ভাই।

– বোকো না। আজকাল টেলিফোন নিতে কী এমন পয়সা লাগে? এখন তো ঘরে ঘরে সকলের ফোন। তোমার ননদাই-এর অফিসের পিওনের পর্যন্ত বাড়িতে ফোন আছে।

–যে কটা পয়সাই খরচা হোক, সেটা তো রোজগার করতে হয়। কথাটা বেশি কড়া হয়ে গেল ভেবে অর্পিতা ঠাট্টার সুরে বলল,–নিজে তো রোজগার

করো না, টাকার মর্ম তুমি কি বুঝবে?

সুমিতা থতোমতো খেয়ে গেল। কেঠো হেসে বলল,–ঠিক আছে বাবা, যা খুশি করো। দাদা যখন আমার, নয় আমিই ছুটে আসব। বলেই ঘুরে শুভেন্দুকে বলল,–ফলগুলো খাস ছোড়দা। লেকমার্কেট থেকে তোর জন্যে সেরা আঙুর এনেছে তোর ভগ্নিপতি। গোটা কলকাতা ঢুঁড়ে এখন এই আঙুর পাবে না।

অর্পিতার মনে হল সুমিতার এই কথাতেও প্রচ্ছন্ন অহমিকা আছে। হঠাৎ দাদার উপর এই দরদ উথলে পড়াটাকেও বেশি বাড়াবাড়ি মনে হয় না কী?

সুমিতা চলে যাওয়ার পর লালটু বলল,–তোমার আজ কী হয়েছে মা ? পিসির সঙ্গে অমন তেড়ে তেড়ে কথা বলছিলে কেন?

অর্পিতা স্পষ্ট জবাব দিল,–কারণ তোমার পিসির ওই আলগা পিরিত আমার ভালো লাগে না।

বুবলি বলে উঠল,– কিন্তু পিসি কথাটা তো খারাপ বলেনি । তুমিই তো বলো ফোন থাকলে কত সুবিধা, অনেক ছোটাছুটি বাঁচে.....

–সে যখন বলেছি, তখন বলেছি। অর্পিতা জেদ ধরেই আছে।– এখন আমার কী হাল তোর পিসি জানে না? দূর থেকে জ্ঞান সবাই মারতে পারে।

–আহা, কটাই বা টাকার ব্যাপার! শুভেন্দু চুপ করে থাকতে পারল না, বলে উঠেছে।

–কটা টাকাই বা দেবে কে?

–আমি দিতে পারি।

–তুমি?

–কেন নয়?

–তারপর মাস মাস বিল?

–বলছি তো আমি আছি।

লালটু হাত ওলটালো,–ব্যস্, আর তো কোনও প্রবলেম নেই?

একেবারে নির্দোষ সংলাপ। অর্পিতার রাগের কোনও কারণনেই, তবু দপ্ করে জ্বলে উঠল,–থাম্। ওসব বড় বড় বুকনি আমি ঢের শুনেছি। কে কী করেছে সারাজীবন, কার কত দৌড়, সব দেখা আছে।

শুভেন্দুর মুখ পলকে কালো। বসে আছে ঘাড় ঝুলিয়ে।

বুবলি খরখরে চোখে মাকে দেখল একবার। পরক্ষণে গিয়ে শুভেন্দুর কাঁধে হাত রেখেছে,–ওঠো বাবা। চলো। অনেকক্ষণ বসে আছ, এবার শুয়ে পড়।

শুভেন্দু পাংশু মুখে ঘরে যাচ্ছে। হাতের বেড়ে বাবাকে আগলে আছে বুবলি। আয়া মহিলাটি ধরতে আসছিল, মাথা নেড়ে বুবলি তাকে বারণ করে দিল।

মেয়ের কাঁধে ভর দিয়ে শুভেন্দুর ওই চলে যাওয়া ক্ষণকাল দেখল অর্পিতা। কী একটা যেন কুনকুন করছে বুকে। কী যে?

লালটু আচমকা চাপা গলায় বলে উঠেছে,–কথাটা ওভাবে বলা কি ঠিক হলো মা?

প্রায় নিজেরই ভাবনার প্রতিধ্বনি। তবু লালটুর মুখ থেকে শুনে সঙ্গে সঙ্গে ঝামটেছে অর্পিতা,–কী ঠিক হলো না?

–বাবা তো ভালো কথাই বলছিল।..... তুচ্ছ একটা ব্যাপার নিয়ে তুমি.... ইটস্ নট ফেয়ার মা।

অর্পিতা চুপ মেরে গেল। নিজেকে নিজেই পড়তে পারছে না যেন। লালটু-বুবলি শুভেন্দুকে মেনে নিক, এটাই তো সে চেয়েছিল। কিন্তু বাবার জন্য এই সহানুভূতি যেন সহ্য হচ্ছে না।

আশ্চর্য, মন যে কখন কী চায়!

।। ছয় ।।

মানুষের মনে যে কত অসংখ্য কুঠুরি। কোনও কুঠুরিতে বাস করে প্রেম, কোনওটায় ঘৃণা, কোথাও দয়া, কোথাও মায়া, আবার কোথাও নিষ্ঠুরতার অধিষ্ঠান। স্নেহ-মমতার জন্যও আছে আলাদা কুঠুরি,ঈর্ষারও আছে আলাদা কক্ষ। জেদের নিজস্ব কুঠুরি আছে। দম্ভেরও। হীনমন্যতারও।

প্রতিটি কুঠরিতে আছে আবার অজস্র ভাগ। ছোট ছোট খোপ। যেমন ধরা যাক ভালোবাসার কুঠুরি। এখানে কোনও খোপে থাকে ভীরু প্রেম, কোনও খাপে বাস করে উদ্দাম ভালোবাসা, আবার কোথাও বা গোধূলিবেলার মরে আসা আলোর মতো ক্ষয়াটে ভালোবাসা টিমটিম করছে। ঈর্ষার কুঠুরিতেও কি কম খোপ? টাকার জন্য ঈর্ষা, যশের জন্য ঈর্ষা, অধিকার পেয়ে ঈর্ষা, অধিকার হারিয়ে ঈর্ষা....। ভালোবাসা পাওয়ার জন্য ঈর্ষার খোপ যত বড়, ভালোবাসা দেওয়ার জন্য ঈর্ষার খোপ তার চেয়ে মোটেই ছোট নয়।

লাখো লাখো অনুভূতি এভাবেই সহবাস করে মনে। পাশাপাশি। সব কুঠুরির অনুভূতির একসঙ্গে দেখা পাওয়ার জো নেই। এক-আধটা কুঠুরির দু'চারটে খোপ মোটামুটি চালু থাকলেই হলো, তাতেই মানুষের দিব্যি চলে যায়।

কুঠুরি আলাদা, খোপ আলাদা, তবু যেন অনুভূতিগুলো পরস্পরের ছোঁয়া পুরোপুরি বাঁচাতে পারে না। মাঝে যে তাদের তেমন আগল নেই, যা আছে তা নেহাতই কিছু সূক্ষ্ম ছিদ্রময় ঝিল্লি। এক খোপের অনুভূতি চুঁইয়ে চুঁইয়ে ঢুকতে পারে আর এক খোপে। কিম্বা অন্য কুঠুরিতে। তেমন হলে তালগোল পাকিয়ে যাওয়া সেই মিশ্র অনুভূতিকে তখন চেনাই দায়।

অর্পিতার মনেরও এখন সেই মিশ্র দশা। সে ঠিক ঠিক চিনতে পারছে না নিজেকে। নিজের মনকে। নিজের বাসনাকে।

এক যুগ আগে শুভেন্দু যখন চলে গিয়েছিল, অর্পিতার মনে যে অনুভূতি ছিল তা শুধুই অবিমিশ্র ঘৃণা আর অপমানবোধ। বাকি কুঠুরি তখন একরকম অকেজো হয়ে পড়েছিল। তারও আগে বছর দু'তিন তাবিজ কবচ মাদুলি করে শুভেন্দুকে শোধরাতে চেয়েছে অর্পিতা, তখন যেন এক হেরে যাওয়ার গ্লানি মনে ছেয়ে থাকত অনুক্ষণ। একটা হীনম্মন্যতাবোধও ছিল যেন। শুভেন্দু রীতিমতো রূপবান পুরুষ, তুলনায় অর্পিতা একান্তই সাদামাটা, তাই বুঝি সে ধরে রাখতে পারেনি শুভেন্দুকে। কিন্তু ঠিক সেরকমটাও তো নয়। শুভেন্দু তো ছিল বিকৃতকাম। শুভেন্দুর দাদা বোনরাই বলত, ওটা নাকি শুভেন্দুর একটা অসুখ। পুরোপুরি হাল ছাড়ার আগে অর্পিতাও হয়তো মনে মনে বিশ্বাস করত কথাটা। ওই বিশ্বাসটুকুই তো তখন ছিল সান্ত্বনা। তখনও কি অর্পিতা ভালোবাসত শুভেন্দুকে? না, ওই কুঠুরি তখন অসাড়। তবু কিছু একটা তো ছিলই। নইলে বারো বছর যে লোকটার সঙ্গে প্রায় যোগাযোগ নেই, যাকে ছাড়াই বেঁচে থাকায় অভ্যস্ত হয়ে গেছে অর্পিতা, আচমকা তার অসুখের খবর পেয়ে সে ছুটে যাবেই বা কেন? শুকনো কর্তব্যবোধে? নাকি লম্পট লোকটাকে ফিরিয়ে এনে সে পাঁচজনের বাহবা কুড়োতে চাইছিল? দ্যাখো সবাই, আমি কত মহৎ!

বোধহয় কিছুটা তাইই। কিছুটা কেন, অনেকটাই তাই। ছেলেমেয়েদের আপত্তি অগ্রাহ্য করে সে মহানুভব সাজতে গিয়েছিল। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব ভ্রুকুটি হানবে জেনেও সে চেয়েছিল নিজের উচ্চতা বাড়াতে। শুভেন্দুকে দয়া দেখাতে চেয়েছিল।

তবু যেন কখন করুণা আর কর্তব্যবোধের ঝিল্লি ভেদ করে প্রেম এসে গেল। তা না হলে শুভেন্দু যখন হঠাৎ হঠাৎ হাত চেপে ধরে অর্পিতার, চোখে গাঢ় ভাষা ফুটে ওঠে, অর্পিতার বুক মুচড়ে মুচড়ে ওঠে কেন? যখন শুভেন্দু বাক্‌শক্তিরহিত, নিজে নিজে পাশটাও ফিরতে পারে না, মাঝরাতে তখন হঠাৎ হঠাৎ ঘুম ভেঙে যেত অর্পিতার। মৃদু রাতবাতি জ্বলছে ঘরে, আবছা সবুজ

আলোয় তড়িঘড়ি উঠে অর্পিতা দেখত শুভেন্দুকে। মানুষটা বেঁচে আছে তো? নিশ্বাস পড়ছে তো?

এক রাতে ঘুমন্ত শুভেন্দুর গলা থেকে হঠাৎ উৎকট আওয়াজ বেরোচ্ছিল। অর্পিতার বাথরুমের কলে জল না থাকলে যেমন শব্দ বেরোয় ঠিক তেমনি। ধড়মড় ছুটে গিয়েছিল অর্পিতা, ঠেলেছিল শুভেন্দুকে, লোকটা চোখ খোলার পরেও বুকের ভিতর সে কী ধড়াস ধড়াস।

এও কি শুধুই করুণা? শুধুই কর্তব্য করে মহান সাজার মেকি প্রয়াস? শুভেন্দু মরে গেলেই বা কী এসে যেত অর্পিতার? মাস গেলে আনা আষ্টেক সিঁদুরখরচা বাঁচত, তার বেশি তো কিছু নয়! সে যে ধরনের সধবা আছে, আর যে ধরনের বিধবা হবে, তার মধ্যেই বা কী এমন প্রভেদ?

কিন্তু সেই ভালোবাসার অনুভূতিটাও নিখাদ থাকতে পারল কই? ঘৃণা রাগ বিরক্তি কিছুই পুরোপুরি মোছে না যে। ঈর্ষার কুঠুরিও সজীব হচ্ছে ক্রমশ, বিন্দু বিন্দু করে মিশে যাচ্ছে ভালোবাসায়। শুধু কি ঈর্ষার কুঠুরি? নাকি অধিকারবোধেরও? যে ছেলেমেয়েকে সে একা একাই বড় করেছে, যারা মা ছাড়া পৃথিবীতে কিছুই জানত না, তাদের বাবার উপর হঠাৎ এত কিসের টান? লালটু-বুবলি শুভেন্দুকে নিছক দয়ার চোখে দেখলে, শুধু নিষ্প্রাণ সেবা করে গেলে, অর্পিতার হয়তো এত খোঁচা লাগত না, কিন্তু শুভেন্দুর দিকে ক্রমশই পাল্লাটা ভারী হয়ে যাচ্ছে যে! কেন এমন হবে?

অর্পিতার খুব কষ্ট হয়। ভীষণ খারাপ লাগে।

টেলিফোন সংক্রান্ত বচসার পর সেদিন রাতে শুভেন্দুর সঙ্গে কথা হয়েছিল অর্পিতার। রাত্রে শুভেন্দুকে ওষুধ খাইয়ে মশারি খাটাচ্ছিল অর্পিতা, শুভেন্দু হঠাৎ বলল, –আমার উপর তোমার আর বিশ্বাস নেই, তাই না?

অর্পিতার তখনও ভেতরে আঁচটা ছিল। ভার গলায় বলল,–বিশ্বাস করার মতো কাজ তুমি করেছ কোন দিন?

–তা অবশ্য ঠিক। তবে আমি এবার সত্যি বদলে গেছি অপু। চেষ্টা করলেও আর আগের জীবনে ফিরতে পারব না । তুমিই ফিরতে দেবে না।

–মানে?

– আমি কি শয়তান? না দানব? তুমি কি ভাবো আমার মধ্যে একটুও কৃতজ্ঞতাবোধ নেই?

–কৃতজ্ঞতা কে চায়?

–তার বেশি আমি কী দিতে পারি? আর কি দেওয়ার অধিকার আছে

আমার?

আশ্চর্য, কথাটাকে ভণিতা মনে হল না অর্পিতার! অন্তত সেই মুহূর্তে। বরং গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে।

শুভেন্দু আবার বলল,–লালটুর কিন্তু তোমার সঙ্গে ওভাবে কথা বলাটা ঠিক হয়নি।

অর্পিতা চমকে তাকিয়েছিল।

শুভেন্দু মাথা নেড়ে বলল,– আমি শুনেছি। আমার কানে সব এসেছে। লালটু কোন সাহসে বলে, ইটস নট ফেয়ার? আমি তো জানি কত দুঃখে তুমি.....

–তার হয়তো বাবার দুঃখ বেশি লেগেছে।

–কেন লাগবে? ছেলেমেয়ের তো বোঝা উচিত তাদের জন্য তুমি কী স্যাক্রিফাইস করেছ।....না না, এ ভালো কথা নয়, লালটুকে একটু বকা দরকার।

–থাক। ছাড়ো।

–উঁহু। আমি লালটুকে বোঝাব, বলব তুমি কক্ষনো মার সঙ্গে অমন ব্যবহার করবে না। তোমাকে ওরা অসম্মান করবে? ছি!

অর্পিতার তক্ষুনি গলে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু কেন যে হু হু করে বেড়ে গেল যন্ত্রণাটা। দু'দিন এসেই ছেলেমেয়েকে বকাবকি করার অধিকারও পেয়ে গেল শুভেন্দু? এতকাল সে যে অন্যায়টা করে এসেছে তার কোনও চিহ্নই রইল না? উলটে সে এখন ছেলেমেয়ের চোখে অর্পিতার ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর করার দায়িত্ব নেবে? মান বাঁচাবে অর্পিতার!

তবে সেদিন আর বাদ-প্রতিবাদে যায়নি অর্পিতা। একটা অসুখের ধাক্কায় শুভেন্দু যদি নিজেকে সংশোধন করে নিতে পারে তার থেকে ভালো কী আর হতে পারে? অধিকারবোধ নিয়ে তুচ্ছ এ অভিমান মনে জিইয়ে না রাখাই ভালো।

কিন্তু অভিমানের কুঠুরিকে নিষ্ক্রিয় রাখা কি এতই সহজ? কিম্বা ঈর্ষার বিশাল কক্ষটাকে?

দিন কয়েক পরের কথা। বিশ্বকর্মা পুজোর আগের রবিবার দুপুরবেলা খেয়ে উঠে বুবলিকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল অর্পিতা। পুজো মার্কেটিং সারবে। টিকিস টিকিস করে দোকান হাট করা অর্পিতার স্বভাব নয়, একদিন বেরোল তো সেই দিনই ঘুরে ঘুরে কেনাকাটা সেরে ফেলল। এরিয়ার এখনো হাতে না এলেও এক্সগ্রাশিয়া পুজো অ্যাডভান্স মিলে গেছে, তাই দিয়েই মোটামুটি হয়ে যাবে বাজারটা।

কাছাকাছি গড়িয়াহাট বাজারই অর্পিতার পছন্দ। সার সার দোকান, অজস্র হকার, যা চাও সবই মজুত। প্রথমেই বুবলি আর দিদির মেয়ের জন্য সালোয়ার কামিজ কিনল, পছন্দ হয়ে গেল বলে বুবলির জন্য এক সেট স্কার্টব্লাউজ। লালটুর পুজোর বাজার লালটুই করে, অর্পিতা হাতে টাকা দিয়েই খালাস, তবু তার জন্য খান দুয়েক টিশার্ট নিল অর্পিতা। তারপর কাজের লোকের কাপড়-চোপড়, দিদির শাড়ি। যতদিন লালটু-বুবলি ছোট ছিল, ভাসুর ননদ তাদের পুজোয় জামাকাপড় দিত, অর্পিতাও সঙ্গে সঙ্গেই তাদের ছেলেমেয়েদের কিনে দিয়েছে। এখন অবশ্য দেওয়া-নেওয়ার পাটটা আর নেই, এবং অর্পিতাও নিশ্চিন্ত। নিজের জন্য একখানা পারফিউম কিনবে ভাবছিল, কিনল না শেষ পর্যন্ত। হাঁটতে হাঁটতে এসে দাঁড়িয়েছে পাঞ্জাবির দোকানের সামনে।

বুবলিকে বলল,– তোর বাবার সাইজ কত হতে পারে রে?

বুবলি ঠোঁট উলটোল,–কী জানি! ...ওই কাউন্টারের লোকটার হাইটই হবে, ওঁকে জিজ্ঞেস করো না ওঁর কত মাপ!

–সাদাই নিই, কী বলিস?

–এহ্, সাদা কেন? সাদায় বড্ড বুড়ো বুড়ো লাগে।

–বুড়োই তো। বাহান্ন-তিপান্ন বছরের লোক।

–মোটেই না। ওটা কোনও বয়সই নয়। বাবার স্বাস্থ্য এখন অনেকটা ফিরেছে.....ওই ডিপ গ্রিনটা নাও না মা।

–অত চড়া রঙ? ক্যাটক্যাট করবে না?

–মোটেই না। ফর্সা রঙ, খুব মানাবে। সেদিন বাবা খুঁজে খুঁজে পুরোন অ্যালবামটা বার করেছিল.....সেখানে একটা ডার্ক কালারের পাঞ্জাবি গায়ে ছবি ছিল বাবার.....

অর্পিতার মনে পড়ল, একখানা শ্যাওলারঙা পাঞ্জাবি ছিল শুভেন্দুর। সঙ্গে সঙ্গে এও মনে হলো, শুভেন্দু এখন অর্পিতার সংসার ঘাঁটাঘাঁটি করছে। পুরোনো অ্যালবাম বার করে ছবি দেখাদেখি চলছে বাপ-মেয়ের!

বুবলি আদুরে গলায় বলল,–কেনো না মা ওটা...খুব হ্যান্ডসাম লাগছিল বাবাকে।

অজান্তেই ইচ্ছে-অনিচ্ছের দোলাচল। তবু কাউন্টারে গেল অর্পিতা। কিনছে। ঘন সবুজ রঙই। লালটুর জন্যও একটা পাঞ্জাবি কিনল। অপেক্ষাকৃত হালকা রঙের। ইচ্ছে করেই। পাজামাও কিনল এক জোড়া করে। বাবারও,ছেলেরও।

দোকানে বেজায় ভিড়। কাউন্টারের লোকটা দেখাতে সময় নিচ্ছে, অর্পিতা হঠাৎই দেখল মেয়ে ফুড়ুৎ। এদিক-ওদিক তাকাতেই চোখে পড়ল দোকানের বাইরে দাঁড়িয়ে একটা লম্বা মতোন ছেলের সঙ্গে খুব হেসে হেসে কথা বলছে বুবলি। ছেলেটা ঝুঁকে বুবলির কানে কানে কী বলল, বুবলি খিলখিল হাসিতে ভেঙে পড়ছে।

প্যাকেট নিয়ে বিল মেটানোর আগেই ফিরে এসেছে বুবলি।দোকান থেকে বেরোতে বেরোতে অর্পিতা জিজ্ঞেস করল,–ছেলেটা কে রে?

–ও তো শুভদীপ।

–তোদের ক্লাসে পড়ে?

–না, গত বছর মাধ্যমিক দিয়েছিল। এখন ক্লাস টুয়েলভে উঠেছে।

–তাই বল্, আমি ভাবছিলাম, তোদের ক্লাসের ছেলে....আগে তো কখনও দেখিনি! তোর সঙ্গে এত খাতির হলো কী করে?

–বা রে, ও তো আমাদের স্কুলের ক্রিকেট টিমের ক্যাপ্টেন ছিল। কী দারুণ ব্যাট করে যদি দেখতে!

–উঁ? অর্পিতা ঈষৎ তরল মেজাজে বলল,–শুধু ক্রিকেট টিমের ক্যাপ্টেন বলেই তোর বন্ধু? নাকি তোর স্পেশাল বন্ধু?

–থ্যাৎ, হেসে কথা বললেই স্পেশাল হয়ে যায় নাকি? বুবলি ফিক করে হাসল,– যেমন তুমি তেমনি বাবা।

–কেন তোর বাবা কী করল?

–তোমারই মতন কৌতূহল।..... সেদিন আমায় জিজ্ঞেস করছিল, হ্যাঁ রে বুবলি, তোর কটা বয়ফ্রেন্ড? আমি তো লিস্ট করে আমার বন্ধুদের নাম করে যাচ্ছি.....অমনি বাবার প্রশ্ন, ওত নাম নয়, অত নাম নয়, স্পেশাল কেউ আছে কিনা বল। হিহি হিহি। আমি যত বলি আমার কাছে সব বন্ধুই সমান, বাবা মানতেই চায় না। হিহি হিহি।

অর্থাৎ বাপ-মেয়েতে এসব আলাপও চলছে আজকাল! অর্পিতা গম্ভীর হয়ে গেল। ছেলেমেয়ের সঙ্গে তার এ ধরনের ঘনিষ্ঠতা নেই যে তা নয়, কিন্তু শুভেন্দুর সঙ্গে বুবলির মাখামাখিটা একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে না কি?

আকাশ আজ অসম্ভব চকচকে। কেউ যেন ধুয়ে দিয়ে গেছে আকাশটাকে, এখানে-ওখানে এখনো লেগে আছে সাবানের ফেনা। ভাদ্রের গুমোট নেই তেমন, হাওয়া বইছে এলোমেলো। পাঁচটা বাজে প্রায়, সূর্যের তেজ আর নেই, পাকা ধানরঙা রোদ্দুরের নরম আলোয় উজ্জ্বল হয়ে আছে বিকেলটা। পুজো মার্কেটিং-

এর ভিড়ও হয়েছে আজ খুব, দু'পা হাঁটতে গেলে দশবার ঠোক্কর খেতে হয়।

আলো আর ঠোক্কর সঙ্গে নিয়েই হাঁটছিল অর্পিতা। ঠোক্করটাই বেশি, আলোটা কমে যাচ্ছে ক্রমশ। সুড়ুৎ সুড়ুৎ পাখির মতো ভিড়ের ফাঁক দিয়ে গলে গলে যাচ্ছে বুবলি, বার বার অর্পিতা পিছিয়ে পড়ছিল।

বাড়ির কাছাকাছি এসে বুবলি দাঁড়িয়ে পড়ল,–কিছু খাওয়ালে না মা?

হাঁটাহাঁটি করে কোমরটা টনটন করছিল অর্পিতার। তার একটু দাঁড়াতে ইচ্ছে করছে। বলল,– কী খাবি?

–খাওয়াও যা খুশি। রোল-টোল.....

মোড়ের ফুটপাথের দোকানটায় বেশ রোল বানায়। মা-মেয়ে চিকেন রোল নিল দুটো। ভিড় থেকে খানিক সরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেয়ে নিচ্ছে।

কূট সংশয়ের খোপটা নড়াচড়া করে উঠল। করব না করব না করেও অর্পিতা জিজ্ঞেস করে ফেলল,–বাবার সঙ্গে আজকাল খুব গপ্পো হয়, না রে?

–হয়। খেতে খেতে দুলছে বুবলি,– হয় বইকি।

–কী রকম?

–কত কী। কোনও ঠিক আছে! স্কুলের গল্প, খেলার গল্প, টিউটোরিয়ালের গল্প.....। একটুকরো কাবাব পড়ে যাচ্ছিল মুখ থেকে, সামলে খপ করে মুখে পুরে নিল বুবলি। চোখ ঘুরিয়ে বলল,– তোমার কথাও হয়।

–আমার কথা?

–হ্যাঁ। বাবা তোমার কথা খুব বলে।....জানো, বাবা এখন খুব রিপেন্টেড। বুবলির মুখটা খুব দুঃখী দুঃখী হয়ে গেল, – সেদিন বাবা তোমার কথা বলতে গিয়ে চোখ মুছছিল। বলছিল, তোর মার কতগুলো বছর যে আমি নষ্ট করে দিলাম! আমাদের একা মানুষ করতে গিয়ে তোমাকে কত সাধ-আহ্লাদ বিসর্জন দিতে হয়েছে.....

অর্পিতা মোটেই খুশি হতে পারল না। উফ্, শুভেন্দুটা কী ওস্তাদ দাবাড়ু, মেপে মেপে চাল দিচ্ছে! কখনও হাসিতামাশার বোড়ে এগোচ্ছে, কখনও নৌকা ভাসাচ্ছে অনুতাপের। ছেলেমেয়েকে জয় করার কী নির্লজ্জ চেষ্টা! আর লালটু-বুবলিই বা কী! দিব্যি ভুলে যাচ্ছে!

লালটু তো আজকাল রীতিমতো নাচছে বাবার কথায়। একদিন সকালে এমনি গল্পগুজব চলছিল বাড়িতে। কী কথায় যেন রানার প্রসঙ্গ এসে পড়ল।

বুবলি বলছিল,–রানাদার কেরিয়ারটা কিন্তু দারুণ হবে। কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করলেই তো এখন পঁচিশ তিরিশ হাজার টাকার চাকরি।

অর্পিতার চোখ কপালে,–অত?

লালটু ভারিক্কি মুখে বলল,–সে তো হবেই। আমাদের ক্লাসের দেবলীনার দাদা তো পাস করেইএকটা আমেরিকান ফার্মে চাকরি পেয়েছে। প্রবেশন পিরিয়ডেই আঠাশ হাজার ।

শুভেন্দু বলল,– তোরও কেরিয়ার খারাপ হবে না। বি এস সি এম এস সি পি এইচ ডি ..... কপালে থাকলে ফরেন যাওয়ার সুযোগও পেয়ে যাবি।

–দাঁড়াও দাঁড়াও, অত সহজ নয়, বি এস সি পাশ করলেই যে এম এস সিতে চান্স পাব তার কোনও কথা নেই। অন্তত ফার্স্টক্লাস পেতে হবে। যদিও বা এম এস সি করতে পারলাম, পি এইচ ডি করার সুযোগ মিলবে এমন কোনও গ্যারান্টি নেই। যদি তাও জোটে, তাহলে ক'বছর ঘষতে তার ঠিক কী! এবং লাস্টলি বলি, পি এইচ ডি করে স্কুলের মাস্টারের জন্য ফ্যা ফ্যা করে ঘুরছে, এমন পঞ্চাশ জনকে আমি এক্ষুনি হাজির করে দিতে পারি।

–তো ফের জয়েন্টে বসছিস না কেন তুই? অনেকেরই তো প্রথম বারে র‍্যাংক খারাপ হয়... তুইই তো সেদিন বলছিলি...

–বলেছিলাম। তবে জয়েন্টে বসলে.... দু'নৌকায় তাল দিতে গেলে অনার্সটা বোধহায় রাখতে পারতাম না।

–হুম্। তা বি এস সি পাস করেও তো কম্পিউটার নিয়ে পড়তে পারিস। ইঞ্জিনিয়ারিং না হোক , কম্পিউটারে তো শুনি আরও অনেক কোর্স আছে।

–ওসব মাথায় ঢুকিও না তো। অর্পিতা তড়িঘড়ি বলে উঠল,–যা পড়ছে, সেটাই মন দিয়ে পড়ুক।

–তবু অলটারনেটিভ কিছু তো ভেবে রাখা ভালো। লালটু যা বলছে..... কেরিয়ারের ভাবনাটাও তো....

–কম্পিউটারের ভালো কোর্স করতে গেলে অনেক টাকা লাগে। আমি কোত্থেকে জোগাড় করব?

–সে একটা বন্দোবস্ত হয়ে যাবে। বলে লালটুর দিকে ফিরে ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি হাসল শুভেন্দু,–ঘাবড়াস না, কিছু একটা হবেই। খরচপত্র নিয়ে ভাবিস না, মন দিয়ে পড়াটা কর।

লালটু কী বুঝল কী জানে, সঙ্গে সঙ্গে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তার চোখমুখ। যেন বাবার কথাটুকুই লালটুর ভরসা! বাবাই লালটুর পায়ের তলার মাটি। লালটুর পিছনে অর্পিতার টিউটর লাগানো, সাধ্যের অতিরিক্ত করে দামি স্কুলে পড়ানো, ভালো রেজাল্টের জন্য অর্পিতার উদগ্রীব হয়ে থাকা, সবই যেন এখন

শূন্যগর্ভ!

নন্দিতা- অমলেরও তো মন জয় করে ফেলেছে শুভেন্দু। এমনকি টুকু, যে প্রথম প্রথম শুভেন্দুকে দেখে দূরে সরে থাকত, তার মুখেও এখন খালি মেসোমশাই মেসোমসাই! শুভেন্দু ভালো হয়ে গিয়ে অর্পিতার আজীবনের সংগ্রামটাকেই নস্যাৎ করে দিল।

নন্দিতা তো আজকাল সব সময়েই বলছে,–শুভেন্দুর এমন চেঞ্জ হয়ে যাবে ভাবতেই পারিনি। স্ট্রোক হয়ে তোর শাপে বর হল, আর তোকে এ সংসারের ঘানি একা টানতে হবে না।

অর্পিতা একদিন ফস করে বলে বসেছিল,–আর বাকিই বা কী আছে রে দিদি?

–নেই কীরে? এখনও তো তোর সব দায়দায়িত্বই... ছেলে এখনও দাঁড়ায়নি, মেয়ের বিয়ে হয়নি, মাথার ওপর ছাদ হয়নি.....শুভেন্দু পাশে থাকলে তোর কত সুবিধে ভাব।

–হুম্।.. তবে তোদের দস্যু রত্নাকরকে বাল্মীকি বানাতে আমায় কিন্তু এখনও প্রচুর ধাক্কা সামলাতে হচ্ছে। খরচের ওপর খরচ.....

–কেন? শুভেন্দুর মাইনেও তো আসছে! আয়াটাও বন্ধ করে দিলি...

হ্যাঁ, নন্দিতার মুখ থেকেও এমন কথা শুনতে হচ্ছে অর্পিতাকে। সেই নন্দিতা, যে কিনা একদিন শুভেন্দুর নাম শুনলে থুতু ফেলত! সেই নন্দিতা, যে কিনা অর্পিতার হাড়ভাঙা লড়াই-এর আদ্যোপান্ত ইতিহাস জানে! সেই নন্দিতা, যার কাছে অর্পিতার বর্তমান খরচের বহর মোটেই অজ্ঞাত নয়!

পুরুষ মানুষ নরকে নেমে যাক আর যে চুলোয় যাক, একবার অনুশোচনা দেখালেই তার সাত খুন মাপ। কী আশ্চর্য!

এই রূঢ় সত্যিটা কি নন্দিতাকে পীড়া দেবে না একটুও? অভিমানে ছেয়ে থাকবে না বুক? ঈর্ষা সংশয় অধিকারবোধ তালগোল পাকিয়ে যাবে না ভালোবাসার সঙ্গে?

কিন্তু সব মিলিয়ে মিশিয়ে অনুভূতিটা এখন কী রকম অর্পিতার? বিষণ্ণতা? না অসহায়তা?

।।সাত।।

অর্পিতাদের অফিসে আজ আনন্দের জোয়ার। লক্ষ্মীপুজোর পরের দিনই লক্ষ্মীলাভ হয়েছে। হিসেবপত্রের দিন শেষ, এরিয়ারের চেক বিলি হলো আজ।

অর্পিতাও খুশি। তবে অন্যদের মতো হাহা হোহো উল্লাসে ফেটে পড়ছে

না। উচ্ছ্বাস তার চিরকালই কম, তাছাড়া অফিসে সে ইদানিং একটু সিঁটিয়েই থাকে। এত কাল অফিসে তার অন্য একটা মহিমা ছিল। চরিত্রহীন স্বামীকে ত্যাগ করে নিজের জোরে বেঁচে আছে, এমন মেয়েদের জন্য বেশিরভাগ মানুষের মনেই একটা শ্রদ্ধার আসন থাকে। এখন সেটা দুভাবে টাল খেয়েছে। একদল' যেন বলতে চায়, খুব তো অ্যাদ্দিন তেজ দেখিয়েছিলি, স্বামীর নাম শুনলে নাক সিঁটকোতিস, এখন সেই পতির সেবা করেই তো ধন্য হচ্ছিস! অন্য দল যেন বলে, এত শক্ত মেয়ে হয়েও শেষে স্বামীর মোহে পড়ে গেলি অর্পিতা! তোকে আমরা আমাদের থেকে একটু উঁচু জগতের মানুষ ভাবতাম, তুইও শেষে একদম সাধারণ পর্যায়ে নেমে গেলি। তবে অর্পিতার বিচ্যুতিতে কোনও পক্ষই বুঝি অখুশি নয়। বরং অর্পিতার যে বিশেষ কোনও মহিমা নেই এটা বুঝতে পেরে সকলেই যেন একটু তৃপ্ত।

মুখে অবশ্য কেউই এসব বলে না। তবু অর্পিতার এমনটাই মনে হয়। একমাত্র মুখফোঁড় শিখাই যা চ্যাটং চ্যাটাং মন্তব্য করেছে এক-আধদিন। নচ্ছার মানুষটাকে সহ্য করছিস কী করে রে অর্পিতা! ওরে পুরুষমানুষ থোড়াই বদলায়! চিতায় উঠলেও পুরুষমানুষের বাসনা মরে না, তুই কিন্তু আবার ধাক্কা খাবি! শিখার সব ভাবনাই বাসনা তথা ইন্দ্রিয়কেন্দ্রিক, অর্পিতার হৃদয়ের অলিগলিতে যে অন্য চোরকাঁটাও বিঁধে থাকতে পারে তা নিয়ে সে আদৌ ভাবিত নয়।

সে যাই হোক, অর্পিতা আজ খুশি। নগদ সাতচল্লিশ হাজার তিনশো উনত্রিশ টাকার চেক বলে কথা। টিফিন থেকে ফিরে আর একবার ব্যাগ খুলে চেকটাকে দেখল অর্পিতা। ঢুলুনি আসছে না আর। ইদানিং দুপুরের তন্দ্রাটা যেন কোথায় চলে গেছে, স্নায়ু টানটান সর্বক্ষণ। রাতেও কি ছাই ঘুম আসে? শুভেন্দু আসার আগে আগে এত ক্লান্ত থাকত যে শত দুশ্চিন্তা থাকলেও শুলেই নাক ডাকছে। শুভেন্দু যখন অসুস্থ, তখনও তো জাগতে চেয়েও ঘুমিয়ে পড়েছে অর্পিতা। এখন শুভেন্দু সম্পূর্ণ সুস্থ, ভেবে দেখতে গেলে সব দিক থেকেই এখন দুশ্চিন্তা তো কম,অথচ....। সারাটা রাত শুয়ে এপাশ-ওপাশ করে অর্পিতা, আরাধনা করে নিদ্রাদেবীর, চোখ বুজে থাকে প্রাণপণে, তবু ঘুম নামে কই!

অর্পিতা কি শেষে স্নায়ুরোগের শিকার হয়ে পড়ছে?

অফিসে আজ কাজের পরিবেশ নেই। কাগজে মাইনে বাড়ার সংবাদেই কাজকর্ম শিকেয় উঠেছিল, টাকা পেয়ে আজ পোয়া বারো। আবু হোসেনের ভঙ্গিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে লোকজন। চা খাচ্ছে ঘন ঘন, টিফিনটাও আজ হেভি হয়েছে, গজল্লাও চলছে জোর।

তার মধ্যেই অর্পিতা ফাইল খুলল একটা। এজেন্সি রিনিউয়ালের কাগজ পত্র। দেখার তেমন কিছু নেই, রুটিন কাজ, কয়েকটা কলামে শুধু আলগা চোখ বুলিয়ে টিক্ মেরে যাচ্ছে।

–কী ম্যাডাম, আজও কাজে এত মনোযোগ?

স্বভাবসুলভ হাসিটি ঝুলিয়ে কমলেশ। অর্পিতা চোখ থেকে চশমা নামাল, – সকাল থেকেই তো বসে আছি।..... ফাইলটা পড়েছিল...

–শুনেছেন তো অফিসে সবাই কী বলছে?

–কী?

–একটা গ্র্যান্ড ফিস্ট করবে। সোনারপুরে দীপঙ্করের চেনা বাগানবাড়ি আছে....

–হ্যাঁ মালবিকা বলছিল বটে।

–আপনি যাবেন তো ? দেওয়ালির পর পরই ডেট ঠিক হচ্ছে।

–দেখি।

–দেখি-টেখি নয়, যেতেই হবে। এটা কিন্তু ফ্যামিলি পিকনিক। মিস্টার, ছেলেমেয়ে সবাইকে আনতে হবে।

অজান্তেই আড়ষ্ট হয়ে গেল অর্পিতা। শুকনো হাসল।

–তা জমিটা এবার তাহলে কিনে ফেলছেন?

–ভাবছি।

–এখনও ভাবছেন। পি এফ লোনের দরখাস্তটা দিয়ে দিন, আমি তাড়াতাড়ি প্রসেস করিয়ে দেব। কী নেবেন? রিফান্ডেবল, না ননরিফান্ডেবল?

–আমি অন্য কথা ভাবছি....আপনার ভায়রাভাই জমি পেয়ে গেছেন?

–খুঁজছে এখনও, স্যুটেবেল হচ্ছে না।.....কেন আপনি নেবেন না জমিটা?

–টাকাটা ভাবছি ফিক্সড করেই রাখি এখন। ছেলেকে পার্ট ওয়ানের পর যদি একটা ভালো কম্পিউটার কোর্স করাতে হয়.....

–কী যে বলেন ম্যাডাম! আপনাদের তো এখন জয়েন্ট ইনকাম। আপনি জমিটা কিনে ফেলুন, তারপর তো মিস্টার রয়েছেনই..... মিস্টারের যেন কত দিন চাকরি আছে আর?

–তা আছে। বছর সাত-আট।

–তাহলে আর কী, মেয়ের বিয়েও হয়ে যাবে এর মধ্যে।

–হুম্।

–মিস্টার কি ট্রান্সফার সিক করলেন?

–কিসের ট্রান্সফার?

–কলকাতায় চলে আসার? নিশ্চয়ই এখন আর ওঁকে একা একা আসানসোলে ছেড়ে দেবেন না?

অর্পিতার ঠোঁটের কোণে একটা রহস্যময় হাসি উঁকি দিয়েই মিলিয়ে গেল। অস্পষ্টভাবে ঘাড় নাড়ল। উত্তরটা হ্যাঁ কি না বোঝা গেল না।

কমলেশ বলল,–ব্যস তাহলে আর কী! ওঁর তো মেডিকেল গ্রাউন্ড আছেই। সঙ্গে আপনিও একটা প্রেয়ার ঠুকে দিন। আরও পোক্ত হবে কেসটা।

–বলছেন?

–অফকোর্স।... অনেক ঝড়ঝাপ্‌টা পুইয়েছেন, এবার বাকি জীবন সুখে শান্তিতে কাটান।

সন্তোষ কাপ-কেটলি হাতে হন হন চলেছে। কমলেশকে দেখে দাঁড়িয়ে গেল,–আপনাকে মেমসাহেব খুঁজছিলেন।

–অসময়ে লিগ্যাল অ্যাডভাইজারের ডাক! কমলেশ হাত উলটে ঘড়ি দেখল। যেতে যেতে বলল,–যা বললাম ওটা করে দিন কিন্তু।

অর্পিতা একটুক্ষণ কপালের রগ টিপে বসে রইল। পরশুই দিদি-জামাইবাবু এসেছিল বাড়িতে। বলছিল, দালালটা নাকি তাড়া দিয়ে মাথা খেয়ে ফেলছে, ঝুলিয়ে না রেখে নিদেনপক্ষে জমি তো বায়না করে রাখুক অর্পিতা। তারপর ধীরে-সুস্থে সার্চ-টার্চ করুক, জায়গাটা অন্তত হাতছাড়া হওয়ার ভয়টা তো থাকবে না।

শুনেই শুভেন্দু বলল–হাঁ হাঁ আর দেরি নয়। ঝটপট বুক করে ফেল। জমি কেনা হয়ে গেলে বাড়ি করার কাজ অনেকটাই এগিয়ে থাকে।

আশ্চর্য কাণ্ড, তখনই অর্পিতার মুখ দিয়ে উলটো গীত ঠিকরে এল,–কিন্তু লালটু-বুবলি তো অত দূরে যেতে চাইছে না।

–কেন?

–এমন জায়গায় থেকে অভ্যেস..... তুলনায় ওদিকটা তো অনেকটা পাড়াগাঁ পাড়াগাঁ। ওরা চাইছে ফ্ল্যাট। এদিকে কোথাও।

–হুম্ ফ্ল্যাটের কথাও অবশ্য ভাবা যায়। তৈরি হচ্ছে এমন কোনও ফ্ল্যাট যদি টারগেট করা যায়..... তুমি তো এরিয়ার পাচ্ছই, তাই দিয়ে যদি একটা অ্যাডভান্স করা যায়...তারপর ধরো, আমাদেরও তো পে-কমিটি বসেছে, ডিসেম্বর নাগাদ রিপোর্ট বেরোবে। নয় নয় করে আমিও কিছু এরিয়ার পাব। অন্তত ষাট-সত্তর। এবং উইদিন দিস ফিনানশিয়াল ইয়ার। তার মানে মার্চের মধ্যে

সওয়া লাখ মতোন দেওয়া হয়ে যাবে। বাকি যা থাকবে..... আমরা জয়েন্ট লোন নিতে পারি। ব্যাংক-ট্যাংক থেকে তো এখন অনেক ইজি টার্মে লোন দিচ্ছে।

অমল বলে উঠল,—দূর দূর, ওসব ফ্ল্যাট-ট্যাটের চক্করে যেও না। বাড়ি হচ্ছে বাড়ি, একটা পুরোপুরি নিজস্ব ব্যাপার। ইচ্ছে মতোন হাত ছড়াও, বাগান করো... তোমরা কাছাকাছি থাকলে আমরাও তোমাদের দেখাশোনা করতে পারব, তোমরাও আমাদের দায়ে-অদায়ে কাজে লাগবে।

—সে আপনার শালির সঙ্গে কথা বলে সেট্‌ল করুন। ও যা চাইবে তাই হবে। বাড়ি করলেও আমরা জয়েন্ট লোন নিতেই পারি। বলতে বলতে শুভেন্দুর মুখে একগাল হাসি,—কষ্টেশিষ্টে এবার আমরা একটা কিছু করেই ফেলব অমলদা। সারাটা জীবন ভাড়া টেনে যাওয়া আর বাড়িঅলার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকা তো কাজের কথা নয়।

অমল ভুরু নাচিয়ে অর্পিতাকে বলল,— কী হে, ঘাড়টা কাত করো। লালটু-বুবলির অবজেকশান নিয়ে অত মাথা ঘামাতে হবে না। লালটু কোথায় চাকরি নিয়ে চলে যাবে, বুবলির কোথায় বিয়ে হবে...আলটিমেটলি তো থাকবে তোমরা দুজন। দুই বুড়োবুড়ি। তখন এই ভিড় ধোঁয়া ধুলোর চেয়ে শান্ত নিরিবিলি পরিবেশই কি ভালো নয়? ...ভাবছ কী ? বাড়ি করার পুরো টেনশানও তো তোমায় আর নিতে হবে না।

সেই মুহূর্ত থেকেই যেন বাড়ি করা ফ্ল্যাট কেনার ভাবনাটা যেন বিষ হয়ে আছে। কমলেশ মনটাকে আরো তেতো করে দিয়েছে।

দুশ্চরিত্র স্বামীর সাহায্য ছাড়াই অর্পিতা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, এই অহংটুকু নিয়েই তো অর্পিতার বেঁচে থাকা। ছেলেমেয়ে নিয়ে সে এক নিটোল বৃত্ত রচনা করে নিয়েছিল, এই ছিল তার সুখ। পরিশ্রম, ক্লান্তি, দৈনন্দিন উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা তাকে জর্জরিত করেছে, কিন্তু হতাশা তাকে গ্রাস করেনি। তুচ্ছ স্বস্তির লোভ দেখিয়ে তাকে কোথায় টেনে নামাতে চাইছে দিদি জামাইবাবু কমলেশের দল? এবার থেকে শুভেন্দুর সঙ্গে একাসনে বসতে হবে অর্পিতাকে? এমনকি লালটু-বুবলির চোখেও? তার এতকালের আত্মত্যাগের একক অহঙ্কার কি এতই মূল্যহীন?

ঘড়িতে তিনটে চল্লিশ। উঠে বাথরুমে গেল অর্পিতা। মুখে-চোখে জল ছেটাল। ঘাড়ের কাছে শিরাটা দপদপ করছে। শীতল জল চেপে চেপে ডলল সেখানে। আয়নার দিকে তাকাল না, রুমালে ঘাড় গলা মুছে বেড়িয়ে এসেছে।

পায়ে পায়ে বিমল দত্তগুপ্তর দরজায়।

–আসতে পারি স্যার?

–ও শিওর। আসুন, আসুন।

অর্পিতা সামান্য ইতস্তত করে বলল,–আপনার টেলিফোনে তো এস টি ডি কানেকশান আছে, আমি কি একটা কল করতে পারি?

–কোথায় করবেন?

–আসানসোলে।

–মানে আপনার হাজব্যান্ডের অফিসে?

–হ্যাঁ।

–তিনি এখন কেমন আছেন?

–ভালো। হাঁটাচলা করছে। একটু-আধটু বাইরেও বেরোচ্ছে।

– গুড। ভেরি গুড। খুব তাড়াতাড়ি কিন্তু রিকভার করলেন।

–হুঁ।

–অফিসের স্টাফদের কাছে তো আপনার কথা শুনি, ইউ হ্যাভ ডান এ মারভেলাস জব।

ক্রমশ অধৈর্য হচ্ছিল অর্পিতা। বলল,–স্যার, ফোনটা করব?

–হ্যাঁ হ্যাঁ, করুন না। টেলিফোনটা এগিয়ে দিল বিমল,– বসে করুন।

বার তিনেকের চেষ্টায় লাইন মিলল। তবে কপাল ভালো আজ, লাইনে ক্যার ক্যার নেই।

ওপারে রথীন দাস এসেছে,– হ্যালো?

– আমি কলকাতা থেকে বলছি। অর্পিতা সেন।

– ও বউদি! বলুন?

ম্যাডাম থেকে বউদি হয়েছে অর্পিতা। কানে লাগে।

অর্পিতা গলা ঝাড়ল,–আপনাদের শুভেন্দুদার এ মাসের স্যালারিটা পেয়েছি। থ্যাংক ইউ।

– শুভেন্দুদা এখন ভালো তো?

– হ্যাঁ, অনেকটাই ভালো। ডাক্তার বলছিল এবার জয়েন করতে পারে।

– বাহ্, সুসংবাদ। শুভেন্দুদাকে ভালো করে তোলার ক্রেডিটটা কিন্তু আপনারই বউদি।....কবে আসছেন শুভেন্দুদা?

– এ মাসের মধ্যেই যাবে।

– আমরা কিন্তু এদিকে কথা বলে রেখেছি বউদি। শুভেন্দুদা পিটিশান

করলেই ট্রান্সফারটা হয়ে যাবে দু'এক মাসের মধ্যেই।

– হ্যাঁ,ওই ব্যাপার নিয়ে কথা বলতেই এখন .... এক্ষুনি ওর কলকাতায় আসার দরকার নেই।

– সে কী ? কেন?

– আমি চাইছি ও আসানসোলেই থাকুক।

রথীন দু'এক সেকেন্ড চুপ। তারপরেই উদ্বিগ্ন স্বরে বলে উঠেছে,–কিন্তু বউদি! এখানে এলেই তো আবার....

–মনে হয় সেটার সম্ভাবনা এখন কম। অর্পিতা আড়চোখে একবার বিমলকে দেখে নিল, –তাছাড়া ওখানে তো আপনারা রইলেনই....

–কিন্তু প্রবলেমটা কী হলো ?

–ও এখানে ঠিক অ্যাডজাস্ট করতে পারছে না। দীর্ঘকালের অনভ্যাস.....

–শুভেন্দুদাকে কি আপনি পৌঁছে দিতে আসছেন?

–দরকার হবে না। একাই চলে যাবে।

টেলিফোন রেখে বিমল দত্তগুপ্তর কৌতূহল নিরসনের জন্য আর এক মুহূর্তও দাঁড়াল না অর্পিতা। বিমল যা আন্দাজ করল, সেটুকুই নয় রটুক অফিসে।

নিজের চেয়ারে ফেরার পর অর্পিতা টের পেল তার সারা শরীর জ্বোরো রুগীর মতো কাঁপছে। বুক ঠেলে একটা কান্না উঠে আসছে যেন। আবার একই সঙ্গে এক অনাবিল মুক্তির স্বাদ।

অর্পিতা চেয়ারের হাতল শক্ত করে চেপে ধরল। এবার বাড়ি ফিরে রূঢ় সিদ্ধান্তটা জানিয়ে দিতে হবে শুভেন্দুকে। আজই। শুভেন্দু হয়তো খুবই আহত হবে। ছেলেমেয়ের কাছে অপ্রিয় হবে অর্পিতা। চেনাজানা পৃথিবীতে প্রতিপন্ন হবে অর্পিতা এক নিষ্ঠুর নারী।

হোক। অর্পিতার তাতে কিছু যায় আসে না। জীবনের কোনও কোনও বাঁকে নিষ্ঠুরতারও প্রয়োজন আছে।

শ্যামলী

অফিস বেরোনোর আগে একবার মায়ের ঘরে এল শ্যামলী। অভ্যাস মতোই। কাঁধে পেল্লাই ভারী ব্যাগ। দেখল বিছানায় পা ছড়িয়ে বসে আছেন সুপ্রভা। সামনে খোলা খবরের কাগজ, তার ওপরে কাঁড়ি খানেক সুপুরি। কটর কটর সুপুরি কাটা চলছে, জাঁতি দিয়ে।

শ্যামলীর ভুরু কুঁচকে গেল। আজকাল আর কোনও কিছুতেই সে ভুরু স্বাভাবিক রাখতে পারে না, অজান্তেই কেন যেন ভাঁজ পড়ে যায়। আজকের দিনটা একটু অন্যরকম, তাতেও নিয়মের কোনও ব্যত্যয় ঘটল না।

রসকষহীন গলায় শ্যামলী জিজ্ঞেস করল,–সক্কাল সক্কাল অকাজ নিয়ে বসে গেলে যে?

সুপ্রভার তোবড়ানো গালে অনাবিল হাসি,–মেয়েটা সুপুরি খেতে বড় ভালবাসে। আগের বার এসে চেয়ে চেয়ে খেয়েছিল। .....ভাবছি রেবাকে দিয়ে মৌরিও ভাজিয়ে রাখব।

–আহা, কী সুখাদ্য! নিজের তো পেট গেছেই, এবার নাতনিরও বারোটা বাজাও।

–একটু মৌরি সুপুরিতে কী হয়?

–বলতে লজ্জা করে না? গলব্লাডারে তোমার অত বড় একটা অপারেশান হল!

–তোর সব তাতেই বাড়াবাড়ি। স্টোন বুঝি সুপুরি থেকে হয়েছিল? তাছাড়া অপারেশান তো হয়েছে ছ বছর আগে...

–যা খুশি করো। এবার পেটের যন্ত্রণায় কোঁকালে হাসপাতালে ফেলে দিয়ে আসব। বলতে বলতে শ্যামলীর চোখ বিছানার কোণে,– কোনও শিক্ষাই তো হয় নি। সাতসকালে বসে জর্দাও গিলছ। খাও খাও, খেয়ে মরো।

চটপট জর্দার কৌটোখানা বালিশের তলায় চালান করলেন সুপ্রভা। অপ্রস্তুত মুখে বললেন, –অত দাঁত খিঁচোচ্ছিস কেন? মেয়েটা কতদিন পর আসছে, কোথায় সারা দিন হাসিখুশি থাকবি তা নয়...

শ্যামলী থমকে গেল। সত্যি এবার প্রায় তেরো মাস পর মা দিদিমার কাছে আসছে ঝুমুর। গত বছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে মাত্র এক রাত্তিরের জন্য

মুখ দেখিয়ে চলে গিয়েছিল, এবার তেমনটা নয়, ঝুমুর থাকবে হপ্তা খানেক! সুপ্রভা ভুল বলেন নি, শ্যামলীর তো আজ আহ্লাদে ডগমগই থাকা উচিত।

কিন্তু তেমন একটা অনুভূতি কেন যে শ্যামলীর প্রাণে জাগছে না! কাল থেকে কত বার স্মৃতিপটে উঁকি দিয়ে গেছে ঝুমুর, কিন্তু সেভাবে প্রফুল্ল হওয়ার মতো কোনও কারণ কিছুতেই খুঁজে পায় নি শ্যামলী। বরং পুরোন ক্ষতগুলোই যেন প্রকট হয়ে উঠছিল। তবে সময়ের একটা পলি পড়েছে তো, যন্ত্রণা আর ততটা নেই। পুরোনো অন্ধকার দিনগুলোকে যেন এখন অনেকটাই নিষ্প্রাণ, ম্যাড়মেড়ে লাগে।

সুপ্রভা পিটপিট তাকাচ্ছেন। বুঝি মেয়ের ক্ষণিক অন্যমনস্কতা লক্ষ করছেন। নরম গলায় বললেন,–আজ তো অফিসে না গেলেই পারতিস খুকু।

ফের শ্যামলীর ভুরুতে ভাঙচুর, –কেন?

–এসেই তোকে দেখতে পেলে মেয়ে খুশি হত।

সত্যিই কি তাই? শ্যামলীর বিশ্বাস হয় না। সামান্য আলগা ভাবে বলল, মেয়ে আমাকে দেখতে আসছে না মা, সে আসছে নিজের কাজে। কটা দিন অতিথি হয়ে থাকবে, যত্নআত্তি করব। সারাক্ষণ মুখের কাছে বসে না থাকলেও চলবে।

–ও কী ভাষা খুকু? কাছে থাকুক, দূরে থাকুক, নিজের পেটেরই তো মেয়ে। মা হয়ে কি তার ওপর অভিমান করা সাজে?

শুধু মা হয়ে কেন, বউ দিদি মেয়ে বোন কেউ হয়েই কি কারুর ওপর তার অভিমান করা শোভা পায়? তেতো মেজাজে কথাগুলো ভাবল শ্যামলী। হাল্‌কা বিষণ্ণতাও যেন চারিয়ে গেল বুকে। এই যে মাকে নিয়ে গত চার বছরে সাত সাতজন হাড়ের ডাক্তারের কাছে চরকি খেল শ্যামলী, কোনও ডাক্তারেরই বারণ শোনে না মা, সময় মতো ওষুধ খায় না, হটওয়াটার ব্যাগ নেয় না, যেটুকুনি সামান্য ব্যায়াম করার কথা বলে ডাক্তার ভুলেও তা করে না, অর্থাৎ শুধু শুধুই জলের মতো শ্যামলীর পয়সা খরচা হয়ে চলেছে–এসব নিয়ে একটা কথা বলো ওমনি মার চোখ ছলছল হয়ে যাবে। নয়তো উল্টো মেজাজ। অন্যের মর্জি সামলে চলাই যার নিয়তি, অভিমান শব্দটা তার অভিধানে থাকবে কেন? মার গলব্লাডার অপারেশানের সময়ে দুষ্প্রাপ্য বি নেগেটিভ রক্ত দরকার, একা ব্লাডব্যাংকে ছোটাছুটি করেছে শ্যামলী, অমন সময়ে ভাই দাদা কেউ পাশে

নেই, তার জন্যই বা কতটুকু অভিমান দেখাতে পেরেছে? আর ঝুমুরের ওপর তো শ্যামলীর কিছুই সাজে না। সে তো সব চেয়ে বড় শত্রু। পেটের মেয়ে ।

শ্যামলী বড় করে একটা শ্বাস টানল। বাঁকা সুরে বলল, –সে তো বটেই। যাক গে, কাজের কথাগুলো শুনে রাখো। রেবাকে ময়দা মেখে রাখতে বলে দিয়েছি, ঝুমুর এলেই যেন লুচি ভেজে দেয়।

–ও নিয়ে তোকে ভাবতে হবে না। আমি দেখব।

–দেখো দয়া করে। মেয়ের কাছে আমায় ছোট কোরো না। মেয়ে যেন না ভাবে...

—আহ্, খুকু!

–দুপুরে টিভির লোকটা আসতে পারে। কী গণ্ডগোল করছে বুঝিয়ে বোলো।

–বলব।

–শুধু তুমি নিজে যে চ্যানেলগুলো দেখো সেগুলোর কথাই বোলো না, সব কটা চ্যানেলই চেক করতে বলবে। বড্ড বেশি ঝিরিঝিরি আসছে। পরে যেন না শুনি বলতে ভুলে গেছি!

–আমার মনে থাকবে। অত আর তোকে বলতে হবে না।

সুপ্রভার মুখ কিঞ্চিৎ ভার। শ্যামলী অপাঙ্গে দেখে নিল মাকে। বলল, –সাধে কি বলি! কাজের কথা একটাও কি ঠিক ঠিক মনে থাকে তোমার?

–তা তো বটেই। সুপ্রভা আর একটু গোমড়া হয়েছেন, –তোমার সংসার তো সারাদিন ভূতে সামলায়।

–ভূত নয়, পেত্নি। শ্যামলী এতক্ষণ পর হেসে ফেলল। কাছে এগিয়ে আলগা করে গাল টিপে দিল মার,–চটো কেন?

সুপ্রভা মুখ ঘুরিয়ে নিলেন,–তুই আজকাল যেন কেমন ধারার হয়ে গেছিস খুকু। কাউকে বিশ্বাস করতে পারিস না।

–বিশ্বাস করার মতো কপাল কোথায় করতে পারলাম মা? শ্যামলী অকারণে জোরে হেসে উঠল,–যাক গে, শোন। তোমার নতুন ওষুধটা কিন্তু আজ থেকে শুরু হবে। দুপুরে খেয়ে উঠে মনে করে খেয়ে নেবে। সঙ্গে একটা অ্যান্টাসিড।

–ওষুধ খেয়ে আর কিছু হবে না। সুপ্রভা এখনও ঠাণ্ডা হন নি, –আমার এই হাঁটুর ব্যথা চিতায় উঠলে তবে যাবে।

–এক্ষুনি এক্ষুনি তো চিতায় উঠছ না। খাও কদিন। এবার রেজাল্ট

না পেলে...

বাকি কথাটুকু গিলে নিল শ্যামলী। সুপ্রভা অস্টিও আর্থ্রাইটিসের রুগী। ডাক্তার বলছে হাঁটুর ফ্লুয়িড শুকিয়ে গেছে, কাটাছেড়াঁ ছাড়া গত্যন্তর নেই,ওষুধ ফিজিওথেরাপি সবই সাময়িক ঠেকনা মাত্র। অপারেশানের নামেই এখন সুপ্রভার হৃৎকম্প হয়।

শ্যামলী প্রসঙ্গটা বদলে ফেলল। গলা নামিয়ে বলল,–আমি তাড়াতাড়ি ফেরার চেষ্টা করব। ঝুমুরকে বোলো।

রেবা রান্নাঘরে মশলা বাটছে। অফিসের দিন সকালে শ্যামলীর আহারের উপকরণ অতি সামান্য। ভাত, ডাল, মাছ ভাজা, ব্যস্। এবারই শুরু হবে বিস্তৃত রান্নাবান্না। সুক্তো, মাছের ঝোল, কাঁটা চচ্চড়ি, আমের টক...। ঝুমুরের জন্য মুরগি এনে রেখেছে শ্যামলী, সেটাও হবে এখন ধীরে সুস্থে। ঝুমুর কি মাছ তেমন পছন্দ করবে? আজকালকার ছেলেমেয়েরা তো মুরগিটুরগিই বেশি ভালবাসে।

চটি পরতে পরতে শ্যামলী গলা ওঠাল,–রেবা...অ্যাই রেবা....মুরগিতে বেশি ঝাল দিস না কিন্তু।

মধ্যবয়সি রেবার তুরন্ত জবাব,–চারটে মাত্র শুকনো লংকা দিয়েছি। বলো তো আরও কমিয়ে নিই?

–না ওইটুকু থাক।... আজ কিন্তু তাড়াতাড়ি পালাস না। বিকেল অব্দি থাকিস।

–কেন বার বার এক কথা বলো গো দিদি? আমি তো বলেইছি আজ পাঁচটা অব্দি থাকব। আমি কি জানি না আজ তোমার মেয়ে আসছে, তোমার মা বুড়ি বেশি নড়াচড়া করতে পারে না....!

খুবই বিশ্বাস্য ঢঙে রেবা কথাগুলো বলছে বটে, তবু শ্যামলীর তেমন প্রতীতি জন্মাল না। রেবা ইদানীং বড্ড নিজের মর্জিমতো কাজ করছে। হয়তো কাল এসে বলবে, কী করব বরের পায়খানা হচ্ছিল..... ছেলে ডাকতে এসেছিল....!

অবিশ্বাস বুকে নিয়েই শ্যামলী বেরিয়ে পড়ল বাড়ি থেকে। কসবার এদিকটায় ইদানীং নতুন একটা জনবসতি গড়ে উঠেছে। চারদিকে অজস্র ফ্ল্যাট, কোনওটারই বয়স দশ পনেরো বছরের বেশি নয়। সামনেই চওড়া বাইপাস

কানেক্টার, গাড়িঘোড়াও চলছে প্রচুর, এককালের ফাঁকা ফাঁকা আধা গ্রাম্য অঞ্চলটা এখন দারুণ জমজমাট।

স্ট্যান্ড থেকে মিনিবাসে উঠল শ্যামলী। বসার জায়গাও পেয়েছে, ড্রাইভারের পাশের সিটে। সবে পৌনে দশটা, এর মধ্যেই জৈষ্ঠ্যের সূর্য যেন গনগনে আগুন। ঝাঁঝাঁলোরোদে পুড়তে শুরু করেছে পৃথিবী। বাতাস রীতিমতো তপ্ত, গা ঝলসানো।

শ্যামলীর সদ্য স্নান করা শরীরে উত্তাপটা বিশ্রী ভাবে ছড়িয়ে পড়ছিল। ব্যাগে কাগজের সুগন্ধি ন্যাপকিন রাখাই থাকে, বার করে বুলিয়ে নিল ঘাড়ে মুখে গলায়। পয়সার ছোট্ট ব্যাগটাও বের করে রাখল হাতে। সোজা অফিসে যাবে? নাকি ইলেক্‌ট্রিক অফিসে নামবে একবার? আজ অবশ্য বিল জমা দেওয়ার লাস্ট ডেট নয়, কাল পরশুও দেওয়া যায়। লাইন খুব বেশি থাকলে নয় বাক্সে চেক ফেলে দেবে। উঁহু, চেক নয়। ক্যাশ। চেক হয়তো হারিয়ে যেতেও পারে। কিম্বা পে করা বিল হয়তো আর পোস্টে ফিরে আসবে না। কাউকে বিশ্বাস নেই। কাউকে বিশ্বাস নেই।

–মাস্‌সিমা, টিকিট!

শ্যামলী ঘুরে তাকাল। ক্ষয়াটে উদ্ধত চেহারার ছোকরা কন্ডাকটার। এই লাইনের অনেক কন্ডাকটারই তার চেনা, একে আজ নতুন দেখছে। ছোকরা তাকে মাসিমা বলে ডাকল কেন? মাত্র আটত্রিশ বছর বয়সেই কি সে যথেষ্ট বুড়ি বুড়ি হয়ে গেছে? নাকি ওটা ছোকরার লব্‌জ?

অপ্রসন্ন মুখে একটা কুড়ি টাকার নোট বাড়িয়ে দিল শ্যামলী। গোমড়া গলায় বলল, –মৌলালি।

–খুচরো দিন মাস্‌সিমা।

–নেই।

ছোকরার যেন বিশ্বাস হল না। টিকিটটা বাড়িয়ে দিয়ে আপন মনে গজগজ করছে।

শ্যামলী বলল,–কী হল, আমার চেঞ্জটা?

–সবাই দস্‌ টাকা বিস্‌ টাকা দিলে খুচরো দেব কোথ্‌থেকে?...দিচ্ছি। হলে পরে দিচ্ছি।

শ্যামলীর চোখ ছোট হল। মেরে দেবে না তো টাকাটা? নামার সময়ে

যদি বলে, আপনাকে দিয়ে দিয়েছিলাম তো? সতর্ক থাকতে হবে, মাঝে মাঝে তাড়া দিতে হবে ছেলেটাকে। কার মনে কী আছে ঠিক কী!

ইন্দ্রিয় প্রখর রেখে জানলার বাইরে চোখ মেলল শ্যামলী। পথ সরে যাচ্ছে পিছনে। টুকরো চিন্তা জড়ো হচ্ছে মাথায়। অজান্তেই। ঝুমুর কলকাতায় পরীক্ষা দিতে আসছে, ভাল কথা... কিন্তু মার বাড়িতে উঠতে চাওয়ার ইচ্ছেটা কেন হল ঝুমুরের? নিজেরই ইচ্ছে? নাকি অন্য কারুর...? কলকাতায় তো হিমাংশুর আত্মীয়স্বজন কম নেই! ঝুমুরের কাকাই তো রয়েছে বেহালায়, ইয়া গাবদা ফ্ল্যাট হাঁকিয়ে। ভায়ের সঙ্গে হিমাংশুর কি সম্পর্ক খারাপ এখন? হতেও পারে। হিমাংশুই বা মেয়েকে তার কাছে থাকতে অ্যালাও করছে কেন? হঠাৎ উদার হয়ে গেল? উঁহু, ব্যাপারটা বেশ সন্দেহজনক। নিশ্চয়ই পিছনে অন্য কোনও উদ্দেশ্য আছে। ঝুমুরের দিদা নাতনির জন্য হেদিয়ে মরে। গত বছর ঝুমুর যখন এল, কতবার করে মা হিমাংশুকে অনুরোধ করেছিল, কটা দিন অন্তত এ বাড়িতে ঝুমুর থেকে যাক। হিমাংশু প্রাক্তন শাশুড়িকে আমলই দেয় নি। কাঠখোট্টা জবাব–ও পিসি পিসেমশায়ের সঙ্গে কেদার বদরি বেড়াতে যাবে, অনেক দিন ধরে প্রোগ্রাম ঠিক করা আছে! তা সেই পিসির বাড়িতেই বা এবার ঝুমুর থাকছে না কেন?

ঝুমুর কি মার কাছে থাকবে বলে আহ্লাদিত? কাল ফোনে গলা শুনে তো তেমন কিছু মনে হল না! বেশ কেজো সুরেই তো কথা বলছিল ঝুমুর, যেমনটা সে বলে শ্যামলীর সঙ্গে।.... কেমন আছ? ...দিদা...? .....আমি কাল কলকাতা যাচ্ছি। দুপুরবেলা। .... তোমার ওখানে থাকব ছ সাত দিন....। নিছকই তথ্য পরিবেশন করার ভঙ্গি, আবেগের ছিটেফোঁটাও ছিল না। কী করে থাকবে, হিমাংশু যা বিষ ঢালে মেয়ের কানে! তোর মা স্বার্থপর! তোর মা জেদি! তোর মা অহংকারী! তোর মা মুখরা! দেখেছিস তো, তোকে ছাড়াও তোর মা কেমন দিব্যি জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে! তোর ওপর কোনও দিনই কোনও টান ছিল না তোর মার!

বলে বলে, এসবই বলে। ছোট থেকেই মেয়ের কানের কাছে এসব বাক্যই আউড়ে গেছে হিমাংশু, মেয়েকে এভাবেই ভাবতে শিখিয়েছে। নইলে পেটের মেয়ে এমন পর হয়ে যায়!

শ্যামলী ক্ষিপ্ত স্বরে কন্ডাকটারকে ডাকল,–অ্যাই, আমার চেঞ্জ?

।। দুই ।।

নিজের চেয়ারে বসে সবে ব্যাগ টেবিলে রেখেছে, পরদা দুলে উঠল,– আসতে পারি ম্যাডাম?

শ্যামলী টেরচা চোখে তাকাল, –আসুন।

ভেতরে ঢুকল লোকটা। বছর পঁয়তাল্লিশ বয়স। হাতে ব্রিফকেস, চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা, পরনে ঘিয়ে রঙ্ সাফারি স্যুট। ব্রিফকেস শুদ্ধুই হাত কপালে তুলল, –নমস্কার ম্যাডাম। আমি সরকার এন্টারপ্রাইজ থেকে আসছি। জিতেন সরকার।

শ্যামলী চেয়ারে হেলান দিল। হাত কাঠের হাতলে। রীতিমতো কর্তৃত্বব্যঞ্জক ভঙ্গি। চোখ টেরচা রেখেই লোকটাকে জরিপ করতে করতে বলল,– রোজ রোজ নিজের নাম ঠিকানা ঘোষণা করেন কেন? আমি তো আপনাকে চিনি।

–না মানে.....আপনি কাজের মানুষ...

–তো?

–রোজ কত লোক আসে আপনার কাছে,...হয়তো আপনার মনে থাকবে না...

ব্যঙ্গ করছে নাকি? তোতলা হয়ে যাওয়াটা কি অভিনয়? জিতেন সরকার সত্যিই তাকে ভয় পায় কি? নাকি ভাবছে মেয়ে-অফিসারদের সামনে মুখে একটা সন্ত্রস্ত ভাব ফুটিয়ে রাখতে পারলে মহিলাটির অহং চরিতার্থ হবে! এবং সে বিগলিত হয়ে পড়বে। আর সেই সুযোগে কাজ হাসিল করে নেবে সরকার এন্টারপ্রাইজ!

শ্যামলীর স্বর রুক্ষ হল,–ভ্যানভ্যান ছাড়ুন। কাজের কথা বলুন।

–হ্যাঁ, বলি।..বসব?

–দাঁড়িয়ে থাকতে তো বলি নি!

লোকটা সামান্য ইতস্তত করে বসেই পড়ল। ব্রিফকেস খুলে একখানা কাগজ বের করে হাসি হাসি মুখে বলল,–আমি অনেকক্ষণ ধরে আপনার জন্য ওয়েট করছি। সেই দশটা থেকে।

পিত্তি জ্বালানো কথাবার্তা! শ্যামলী প্রায় খেঁকিয়ে উঠল,–কেন এসেছেন অত তাড়াতাড়ি? সরকারি অফিস কখন খোলে জানেন না?

–না, ভাবলাম যদি আপনি তাড়াতাড়ি এসে পড়েন! আপনাদের তো

বাইরেও ডিউটি থাকে, অনেক সময় তো এসেই বেরিয়ে যান! এদিকে আমার ব্যাপারটা খুব আরজেন্ট...

–কী আরজেন্ট? কিসের আরজেন্ট?

জিতেন কথা না বলে একটা কাগজ বাড়িয়ে দিল।

শ্যামলী নিল না হাতে। জিজ্ঞেস করল, –কী ওটা?

–গভর্নমেন্ট অর্ডার ম্যাডাম। আমরা যে লাইসেন্সের দরখাস্তটা করেছিলাম, সেই সম্পর্কে।

–অ। কী আছে ওতে?

–ওই আমাদের ফ্যাক্টরি ইন্‌স্‌পেকশান করে আসার ব্যাপারটা। জিতেন বিনয়ের অবতার হয়ে গেল, –এখন আপনি যদি দয়া করে আজ কালের মধ্যে একটা সময় দেন।

শ্যামলী সামান্য থতমত খেয়ে গেল। মাস দুয়েক ধরে অফিসে হাঁটাহাঁটি করছে জিতেন সরকার। নতুন লাইসেন্সের জন্য একটা আবেদন করেছিল, শ্যামলীরই কাছে। সরকারী নিয়ম অনুযায়ী শ্যামলীর একবার জিতেন সরকারের কারখানা পরিদর্শন করে আসার কথা। তার রিপোর্টের ভিত্তিতেই মঞ্জুর হবে সরকার এন্টারপ্রাইজের আবেদন। যাচ্ছি যাব করে যাওয়া হয় নি শ্যামলীর। জিতেন সরকারকে তার তেমন পছন্দও নয়। জিতেনের দাদা হরেন সরকার এই ডিপার্টমেন্টের অনেক পুরোন কন্ট্রাকটার, শ্যামলীকে সে মোটামুটি মান্যিগন্যিও করে। এই জিতেন দাদার ছায়াতেই ছিল এতকাল, সম্প্রতি পৃথক ব্যবসা গড়েছে। ভায়ের সম্পর্কে হরেনের ঝুড়ি ঝুড়ি অভিযোগ। টাকা চুরি, ব্যবসার সর্বনাশ করে দেওয়া, মার্কেটে হরেনের বদনাম ছড়ানো... । এই সব নিয়ে মাথা ঘামানো অবশ্য শ্যামলীর এক্তিয়ারে পড়ে না, তবু জেনেশুনে এমন একটা অসৎ লোককে এক কথায় ব্যবসার লাইসেন্সই বা সে পাইয়ে দেবে কেন!

এই অফিসে ঘুরে ঘুরে খুব নাকাল হয়েছিল জিতেন। গত দিনই আভাস দিয়েছিল সে এবার হেড কোয়ার্টারে ছুটবে। অর্থাৎ সোজা আঙুলে যখন ঘি উঠছে না, বাঁকা আঙুল প্রয়োগ করবে। এবং তাই করল? শ্যামলীকে আর পাত্তাই দিল না?

অস্বস্তিটা কাটানোর জন্য মুখে শ্লেষের হাসি ফোটাল শ্যামলী,–কবে বেরোল

অর্ডার?

–আজ্ঞে, পরশু।

–এর মধ্যেই আপনি কপি পেয়ে গেলেন?

–কাল আমার হাতে গুঁজে দিল ম্যাডাম।

হুঁহ্, গুঁজে দিল! নির্ঘাৎ মোটা টাকা ঢেলেছে হেড অফিসে!

কপাল কুঁচকে শ্যামলী বলল, –এমনি এমনি অর্ডার হয়ে গেল? কী বলেছেন ওখানে আমার নামে?

–বিশ্বাস করুন ম্যাডাম, আপনার বিরুদ্ধে আমার কোনও কমপ্লেন নেই। জিতেন সঙ্গে সঙ্গে হাত জোড় করেছে,–আমার সত্যি সত্যি তাড়া আছে, তাই ওখানে একটু প্লিড করেছিলাম। অনেক ইন্‌ভেস্টমেন্ট করে ফেলেছি ম্যাডাম।

চুকলি খেয়ে সাফাই গাওয়া! শ্যামলীর গা চিড়বিড় করে উঠল। নয় নয় করে এই ডিপার্টমেন্টে তার দশ বছর চাকরি হয়ে গেল, এমন ভিজে বেড়াল সেজে থাকা মানুষ সে কম দেখে নি। মুখে সব সময়ে একটা গদগদ ভাব, কিন্তু মনে মনে মহিলা অফিসারদের এরা খুবই দুব্‌লা জীব ভাবে। নানান কায়দায় চাপ সৃষ্টি করে অপ্রীতিকর অবস্থার দিকে ঠেলে দিতে চায়। আর শ্যামলীকে তো সবাই দুব্‌লা ভাবেই। কী ঘরে, কী বাইরে। তাই বুঝেই না সর্বত্র চাপ, সর্বক্ষণ চাপ। এই যে ঝুমুর আসছে আজ, এও কি চাপের সম্মুখীন হওয়া নয়?

জিতেন ফের বলল,–তাহলে ম্যাডাম, কবে আপনার যাওয়ার সুবিধে হবে? আজ কি যেতে পারবেন? আমি কিন্তু গাড়ি এনেছি।

শ্যামলী ছাড়াও আরও দুজন অফিসার বসে এই মাঝারি সাইজের ঘরখানায়। জয়ন্ত ঘোষ, আর সরোজ হালদার। জয়ন্ত শ্যামলীরই সমবয়সি, সে এসেছে এই মাত্র। সরোজের টেবিল চেয়ার এখনও ফাঁকা। জয়ন্তর সামনে দুটো লোক বসে, বোধহয় পার্টি আলমারি খুলে কী সব ফাইল বার করছে জয়ন্ত , তবে তার চোখ এদিকেই ঘুরছে ঘন ঘন। যেন কৌতূহলী মার্জার!

এ অফিসে সকলেরই ইন্দ্রিয় অতি প্রখর। বিশেষ করে শ্রবণেন্দ্রিয়। জয়ন্তর কান বাঁচিয়ে শ্যামলী বলল,–অর্ডার যদি হয়েই থাকে, সেটা তো আমার নামেই হওয়ার কথা। আমার হাতে আগে অর্ডারটা পৌঁছোক। আপনি কোথ্‌থেকে কী করে জোগাড় করেছেন, সেটা দেখে আমি কাজ করব কেন?

–আপনার চিঠিও এসে গেছে ম্যাডাম। জিতেন ঘাড় চুলকোল, –ওই যে

ধারে....পিওন রেখে গেছে।

তাই তো! সত্যিই তো! একখানা বাদামী খাম পড়ে আছে বটে টেবিলের ধারে। এতক্ষণ শ্যামলীর নজরে পড়ে নি কেন? এই জিতেন সরকারটি তো মহা ঘোড়েল, আস্ত শয়তানের যাশু! ব্যাটা নিজেই কুরিয়ার হয়ে হেড অফিস থেকে চিঠিখানা বয়ে আনে নি তো? অবশ্য চিঠিটা কালও অফিসে এসে থাকতে পারে। বাইরের কাজ সেরে কাল বিকেলে আর অফিসে ফেরে নি শ্যামলী, হয়তো তখনই...। অফিস পিওন অনন্তটা বেজায় ছোঁকছোঁকে, পাঁচ দশটা টাকা পেয়ে ওই হয়তো সাতসকালে রেখে গেছে টেবিলে।

শ্যামলী খামটা খুলল। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ল সরকারি নির্দেশনামাটা। ইচ্ছে করে অনেকটা বেশি সময় নিয়ে। তাকে এক সপ্তাহের মধ্যে জিতেনের নতুন কারখানা পরিদর্শন করে রিপোর্ট পাঠাতে বলেছে হেড অফিস। ইন দি ইন্টারেস্ট অফ পাবলিক সার্ভিস ট্রিট দিসলেটার অ্যাজ এক্সট্রিমলি আরজেন্ট! সরকারি ভাষার কী রঙঢঙ্! পয়সা কামাবে জিতেন, আর সেবা হবে জনগণের! ছোঃ ছোঃ। ওই বাক্যটুকু লেখানোর জন্যই জিতেনকে কত খসাতে হয়েছে কে জানে!

জিতেন অধীর চোখে তাকিয়ে। অস্ফুটে বলল,–তাহলে ম্যাডাম....?

–বসুন। আসছি। শ্যামলী তড়াক করে উঠে দাঁড়াল। চিঠি হাতে সোজা পাশের ঘরে, অজিত সান্যালের টেবিলে। শব্দ করে চেয়ার টানল শ্যামলী। বসতে বসতে কাগজটা ছুঁড়ে দিয়েছে অজিতের দিকে, –এটা কী হল?

ডেপুটি ডিরেক্টর অজিত সান্যালের বয়স বছর পঞ্চান্ন, ভালমানুষ ভালমানুষ চেহারা। গোলগাল মুখ, সরু গোঁফ, নিখুঁত কামানো গাল।

চোখের কোলে শ্বেতচিহ্ন, কোলেস্টেরলের। চা বিস্কুট খাওয়ার মতো করে ঘুষ খেতে পারে অজিত।

চিঠিটা অজিত দেখলই না। শ্যামলীকে একটুখানি স্থির দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করল। তারপর মুখে একগাল হাসি, –জোর চটেছ মনে হচ্ছে?

–আপনারা আমাকে অপমান করার জন্য এরকম একটা অর্ডার করালেন?

–আমায় জড়াচ্ছ কেন বোনটি? জিতেন সরকার তো হেড অফিস থেকে অর্ডার বের করে এনেছে।

–আমি সব বুঝি। কে কোথায় কী ভাবে কলকাঠি নাড়ে জানতে আমার

ধারে....পিওন রেখে গেছে।

তাই তো! সত্যিই তো! একখানা বাদামী খাম পড়ে আছে বটে টেবিলের ধারে। এতক্ষণ শ্যামলীর নজরে পড়ে নি কেন? এই জিতেন সরকারটি তো মহা ঘোড়েল, আস্ত শয়তানের যাশু! ব্যাটা নিজেই কুরিয়ার হয়ে হেড অফিস থেকে চিঠিখানা বয়ে আনে নি তো? অবশ্য চিঠিটা কালও অফিসে এসে থাকতে পারে। বাইরের কাজ সেরে কাল বিকেলে আর অফিসে ফেরে নি শ্যামলী, হয়তো তখনই...। অফিস পিওন অনন্তটা বেজায় ছোঁকছোঁকে, পাঁচ দশটা টাকা পেয়ে ওই হয়তো সাতসকালে রেখে গেছে টেবিলে।

শ্যামলী খামটা খুলল। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ল সরকারি নির্দেশনামাটা। ইচ্ছে করে অনেকটা বেশি সময় নিয়ে। তাকে এক সপ্তাহের মধ্যে জিতেনের নতুন কারখানা পরিদর্শন করে রিপোর্ট পাঠাতে বলেছে হেড অফিস। ইন দি ইন্টারেস্ট অফ পাবলিক সার্ভিস ট্রিট দিসলেটার অ্যাজ এক্সট্রিমলি আরজেন্ট! সরকারি ভাষার কী রঙঢঙ্! পয়সা কামাবে জিতেন, আর সেবা হবে জনগণের! ছোঃ ছোঃ। ওই বাক্যটুকু লেখানোর জন্যই জিতেনকে কত খসাতে হয়েছে কে জানে!

জিতেন অধীর চোখে তাকিয়ে। অস্ফুটে বলল,–তাহলে ম্যাডাম....?

–বসুন। আসছি। শ্যামলী তড়াক করে উঠে দাঁড়াল। চিঠি হাতে সোজা পাশের ঘরে, অজিত সান্যালের টেবিলে। শব্দ করে চেয়ার টানল শ্যামলী। বসতে বসতে কাগজটা ছুঁড়ে দিয়েছে অজিতের দিকে, –এটা কী হল?

ডেপুটি ডিরেক্টর অজিত সান্যালের বয়স বছর পঞ্চান্ন, ভালমানুষ ভালমানুষ চেহারা। গোলগাল মুখ, সরু গোঁফ, নিখুঁত কামানো গাল।

চোখের কোলে শ্বেতচিহ্ন, কোলেস্টেরলের। চা বিস্কুট খাওয়ার মতো করে ঘুষ খেতে পারে অজিত।

চিঠিটা অজিত দেখলই না। শ্যামলীকে একটুখানি স্থির দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করল। তারপর মুখে একগাল হাসি, –জোর চটেছ মনে হচ্ছে?

–আপনারা আমাকে অপমান করার জন্য এরকম একটা অর্ডার করালেন?

–আমায় জড়াচ্ছ কেন বোনটি? জিতেন সরকার তো হেড অফিস থেকে অর্ডার বের করে এনেছে।

–আমি সব বুঝি। কে কোথায় কী ভাবে কলকাঠি নাড়ে জানতে আমার

করে!

চেম্বারে ফিরে ধপ করে চেয়ারে বসল শ্যামলী। জিতেনকে দেখছে হাসি হাসি মুখে,–কাজটা তাহলে আপনি করাবেনই?

জিতেন জিভ কাটল,–ছি ছি, এ কী বলছেন ম্যাডাম! আমার নতুন কারখানায় আপনার পায়ের ধুলো পড়বে এ তো আমার সৌভাগ্য।

–বলছেন?....কাল আসুন তাহলে।

–আজ পারবেন না?

–না, কালই যাব। প্লিজ। আজ রোহন ফুড প্রোডাক্টসে প্রোগ্রাম দেওয়া আছে, একটু পরেই ওরা নিতে আসবে।

–কাল তাহলে কখন ম্যাডাম?

–ফার্স্ট আওয়ারেই আসুন।

–অনেক ধন্যবাদ।

জিতেন সরকার বেরিয়ে যাওয়ার পর খানিকক্ষণ থম বসে রইল শ্যামলী। সে কি মিথ্যাচরণ করল? ফুঃ। তার সঙ্গে কে কবে সরল ব্যবহার করেছে? এই কুটিল সংসারে সেই বা কেন চিরকাল বোকা হয়ে থাকবে? ন্যায়অন্যায় বলে দুনিয়ায় কিচ্ছু নেই। ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে গেলে জিতেনকে ঘোড়ার চাঁট খেতেই হবে। মর ব্যাটা এখন সাত দিন ঘুরে ঘুরে। জুতোর সুকতলা খুইয়ে ফ্যাল্।

শ্যামলীর জ্বালাটা যেন জুড়োল কিছুটা। উঠে ঘটাং করে আলমারি খুলল, ফাইল বার করল একতাড়া। অনেকগুলো ফ্যাক্টরি পরিদর্শন করেছে এ মাসে, একটারও রিপোর্ট পাঠানো হয় নি। আগামী সাত দিন সে আসবে না, এখন বসে যতটা সম্ভব কাজ এগিয়ে রাখা দরকার। নইলে কথা উঠবে। সামনের টেবিলে সরোজ হালদার এখনও আসে নি। সরোজবাবুর রিপোর্ট রিটার্ন মাসের পর মাস বাকি পড়ে থাকে, কিন্তু তাই নিয়ে টুঁ শব্দটি হয় না। কিন্তু শ্যামলীর বেলায় এক লক্ষ শব্দ বাজবে, শ্যামলী জানে।

শ্যামলী জয়ন্ত সরোজ কারুরই কাজ ঠিক গতানুগতিক ধাঁচের নয়। কারখানা ঘুরে ঘুরে কিছু বিশেষ ধরনের মেসিনপত্র পরীক্ষা করতে হয় তাদের। বলতে গেলে শ্যামলীদের সংশাপত্রের ওপরই নির্ভর করে ওই সব মেসিন কলে কারখানায় ব্যবহার করা যাবে কি যাবে না। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বসে

চাকরিটা জুটিয়েছিল শ্যামলী। এখানে জয়েন করার পর ট্রেনিং নিয়ে এসেছে ছ মাসের। টেকনিকাল ইন্সটিটিউট থেকে। যে সব কোম্পানী ওই সব যন্ত্র তৈরি করে বা সারায়, তাদের লাইসেন্স দেওয়াটাও শ্যামলীদেরই কাজের অঙ্গ। এই চাকরিতে মেয়ে খুব বেশি নেই, গোটা পশ্চিম বাংলায় মোটে জনা ছয়েক। কাজটা তথাকথিত মেয়েলি ধরনের নয় বলে শ্যামলীদের একটু বেশি মাত্রায় সচেতন থাকতে হয়। সমালোচনার ভয়ে। বিদ্রূপের আশঙ্কায়।

শ্যামলীর বাড়িও কি শ্যামলীর এই চাকরি সহজে মেনে নিয়েছিল? শিবপ্রসাদ তখনও বেঁচে, প্রবল আপত্তি তুলেছিলেন তিনি। মেয়ে হয়ে কারখানায় কারখানায় ঘুরে কাজ করবে এ কেমন কথা! তোর তো পেটের চিন্তা নেই, এই বেলডাঙাতে থেকেই অন্য কোনও চাকরির চেষ্টা কর না, কোনও স্কুল টুল...। সুপ্রভারও এতটুকু সম্মতি ছিল না। একা মেয়ে কলকাতায় গিয়ে থাকবে, এই দুশ্চিন্তাতেই তিনি শিহরিত। সর্বোদয়ও বুঝিয়েছিল বোনকে। নরমে গরমে,যুক্তি দিয়ে, ভয় দেখিয়ে।

কিন্তু শ্যামলী তখন জেদে পুড়ছে। বুকের ভেতর অহর্নিশি জ্বালাপোড়া। হেরে যাওয়ার। অপমানের। একজন পুরুষ তাকে অতি নগণ্য জীব বলে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছে, পুরুষের জগতে গিয়েই তাকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হবে। টক্কর দিতে হবে পুরুষের সঙ্গে। প্রমাণ করতে হবে সে উপেক্ষা করার মতো প্রাণী নয়।

সমকক্ষ হওয়ার জন্যই কি অফিসে সর্বক্ষণ রূঢ়তার বর্ম পরে থাকে শ্যামলী? যাকে হাতের মুঠোয় পায় তাকেই নাজেহাল করে ছাড়ে?

আসলে অবিশ্বাস। সেই অবিশ্বাস। রন্ধ্রে রন্ধ্রে অবিশ্বাস। অবিশ্বাসই বুঝি অক্টোপাসের মতো চতুর্দিক থেকে কামড়ে ধরে আছে শ্যামলীকে। এর বাইরে শ্যামলী যাবে কী করে!

জয়ন্ত লোক দুটোর সঙ্গে অফিস ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। শ্যামলীর টেবিলের সামনে দাঁড়াল একটু। লঘু স্বরে বলল, –কী ব্যাপার, আজ এত কাজে মন?

সঙ্গে সঙ্গে শ্যামলীর ঠোঁটে বাঁকা জবাব,–অন্য দিন বুঝি ফাঁকি মারি?

জয়ন্ত একটু চুপ। বুঝি আঁচ করতে চাইল সহকর্মীর মেজাজটা। শ্যামলী তার ব্যাচমেট, দুজনের মোটামুটি বন্ধুত্বও আছে, তবু সে শ্যামলীর সঙ্গে বেশি রসিকতা জুড়তে ভয়ই পায়।

শ্যামলী চোখ ঘোরাল, –কী হল, বললে না?

–আহা, সব সময়ে এত খেপে যাও কেন? জয়ন্ত গলা নামাল,–জিতেন সরকারের কেসটা কী হল?

–জানো না?

আবার জয়ন্ত একটু চুপ। অর্থাৎ জানে। তারপর বলল,–ডেট্ দিলে?

শ্যামলীর পলকের জন্য মনে হল সত্যি কথাটা বলে ফেলে। উঁহু, জয়ন্ত র সঙ্গে অজিতদার খুব মাখামাখি আছে, নির্ঘাৎ ফাঁস করে দেবে।

শান্তভাবে বলল, –হ্যাঁ। কাল।

–করেই দাও । বোঝো তো, কেসটা নিয়ে মিছিমিছি একটা ঘোঁট পাকছে।

–হুঁ।

–তোমার মাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেছিলে?

–দেখিয়েছি তো। রেজাল্ট কিছু হবে কিনা কে জানে। অপারেশানেই যেতে হবে মনে হয়।

–আমার একটা পরামর্শ শুনবে?...অপারেশানেও অস্টিও আর্থ্রাইটিস পুরোপুরি কিওর হয় না। তুমি অন্য কিছু ট্রাই করতে পারো।

–কী রকম?

–আমি একজন তিব্বতী ডাক্তারের খোঁজ পেয়েছি। হার্বাল মেডিসিন।

–বসে কোথায়?

–লেক গার্ডেন্সে। খুব ভিড় হয় এখন। আমার মেজো শালা থাকে লেক গার্ডেন্সে। ওর একটু চেনাজানা আছে। বলো তো ওকে দিয়ে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে দিতে পারি।

–দেখি কদিন। নতুন ওষুধ তো সবে শুরু হল।.... দরকার হলে বলব। অপারেশান তো আমারও ইচ্ছে নয়।

–বোলো। জয়ন্ত প্রসঙ্গান্তরে গেল, –তুমি টাকাটা কবে দিচ্ছ?

–কিসের টাকা?

–ভুলে গেলে? বললাম না সেদিন, এবার অ্যানুয়াল কনফারেন্সটা একটু বড় করে হচ্ছে। সেন্ট্রালের দুজন মিনিস্টার আসবে...

–আমাকে জড়াচ্ছ কেন ভাই? আমি কোনও ইউনিয়ন টিউনিয়নে নেই।

–এ কেমন কথা! ইউনিয়নে সবাই আছে। তুমিও আছ। বিপদে আপদে

ইউনিয়ন ছাড়া কে পাশে দাঁড়াবে?

–কে কত পাশে থাকে আমার জানা আছে। শ্যামলীর স্বর ফের কঠিন হয়ে গেছে,–লাস্ট ইয়ার মেট্রো ইন্ডিয়ার সঙ্গে যখন আমার ঝামেলা হল, কারুর তো ভাই টিকি দেখা যায় নি! ওপরতলা থেকে যা ইচ্ছে অর্ডার আসছে, তাই নিয়েই বা কে কবে কী প্রতিবাদ জানিয়েছে?

–জানানো হয় না? সেবার তো ডেপুটেশানও দিয়েছিলাম।

–লাভ হয় নি কিছু।

–তবু বলা তো হয়েছিল। হয় নি?

শ্যামলী চুপ।

– তাহলে কবে দিচ্ছ টাকা?

–ফোর্স করলে দিয়ে দেব। তবে আমি ইউনিয়নে নেই।

–ওফ্, তুমি না...একই রকম একবগ্গা রয়ে গেলে।

ঠাট্টাটা ছুঁড়ে দিয়েই জয়ন্ত চলে গেল। শ্যামলী আনমনে দরজার দিকে তাকিয়ে রইল একটুক্ষণ। মনে মনে বলল,–হ্যাঁ, তাই। আমি একবগ্গাই। এই দুনিয়াই আমার তেমনটা হতে শিখিয়েছে।

।। তিন ।।

শ্যামলী ভেবেছিল চারটে-সাড়ে চারটের মধ্যে ফিরে আসবে। কিন্তু রোহন ফুড প্রোডাক্টসে কাজ সারতে অনেকটা সময় লেগে গেল আজ। কোম্পানীর গাড়ি যখন শ্যামলীকে বাড়ির সামনে নামিয়ে দিয়ে গেল, সূর্য তখন রঙ বদলে ফেলেছে।

ফ্ল্যাটের কম্পাউন্ডে ঢুকতে ঢুকতে আঁচলে ঘাড় গলা মুছল শ্যামলী। প্রচণ্ড খাটুনি গেছে আজ, শরীর যেন আর বইছে না। পেটেও চনচনে খিদে। ফ্যাক্টরিতে মিষ্টিফিস্টি দিয়েছিল প্রচুর, একটার বেশি রসগোল্লা মুখে তোলে নি। মিষ্টি খেতে এমনিই সে ভালবাসে না, তার ওপর অত মিষ্টি দেখলে কেমন গা গুলিয়ে ওঠে। জেনেশুনেই কি লোকগুলো ওভাবে আপ্যায়ন করে? কোল্ড ড্রিংকস খাইয়েছে অবশ্য বার দুয়েক। দু বোতল পানীয় কতক্ষণই বা থাকে পাকস্থলীতে!

সিঁড়ি দিয়ে ওঠার মুখে সার সার লেটারবক্স। নিজের নাম লেখা বাক্সটা একবার খুলে দেখল শ্যামলী। রোজকার মতোই। দুটো চারটে দরকারী বিলপত্র ছাড়া তেমন কিছু থাকে না, তবু খুলে দেখে একবার। অভ্যাস। ইলেক্ট্রিক

বিল এসে গেছে, টেলিফোনেরটা আসবে সামনের মাসে, চিঠিপত্র যথারীতি নেই। কেই বা লিখবে চিঠি তাকে? দাদা? ভাই? মাসে দু মাসে মা'র খোঁজখবর নিতে মিনিট কয়েকের জন্য ফোন করে তারা, এই না শ্যামলীর কত সৌভাগ্য!

ফ্ল্যাটের দরজায় এসে শ্যামলী দাঁড়িয়ে রইল একটুক্ষণ । দোতলা উঠতে কটাই বা সিঁড়ি, এটুকুতে আজকাল কেমন যেন হাঁপিয়ে ওঠে, বুকে একটা চাপা অস্বস্তি হয়।

খানিক সুস্থিত হয়ে শ্যামলী ফ্ল্যাটের বেল টিপল। ঈষৎ দুরুদুরু বুকে। মেয়েটা শেষ পর্যন্ত এসেছে তো?

দরজা খুলে যেতেই বুকটা যেন চলকে উঠল। সামনে ঝুমুর!

পলকের খুশিটাকে পলকে গিলে নিল শ্যামলী। ঢুকে চটি ছাড়তে ছাড়তে নিরুত্তাপ গলায় জিজ্ঞেস করল,–কখন এলে?

ঝুমুর আলগা হাসল,–সাড়ে চারটে।

–লালগোলায় এলে?

–হ্যাঁ।...ট্রেন লেট ছিল একটু।

–এসে খাওয়া দাওয়া করেছ?

–শেয়ালদায় খেয়েছিলাম। বাবাই ওখানে রিফ্রেশমেন্ট রুমে নিয়ে গিয়ে...

হিমাংশুই মেয়েকে পৌঁছতে এসেছে তাহলে? আজই কি ফিরে যাবে বহরমপুর? নাকি কলকাতাতেই কদিন আস্তানা গাড়বে? উঁহু। তাহলে মেয়েকে এখানে ছেড়ে দেবে কেন?

শ্যামলী কোনও প্রশ্ন করল না। বলল,–আমি কিন্তু তোমার খাওয়ার ব্যবস্থা করে রেখে গিয়েছিলাম।

–জানি তো। আমি আসার পর থেকেই দিদার খাও খাও চলছে।

–দিদা কী করছে?

–জপে বসেছে।

–ও।

শ্যামলী আর কথা খুঁজে পেল না। বাথরুম ঘুরে এসে বসল ফালি ড্রয়িং স্পেসটায়। দরজার সামনের এই ছোট্ট পরিসরটুকুই এ ফ্ল্যাটের বসার জায়গা। বেতের চেয়ার টেবিল শোভিত।

ঝুমুর ফ্যান চালিয়ে দিয়েছে। আলগোছে প্রশ্ন করল,–খুব গরম আজ,

তাই না?

শ্যামলী ঘাড় নাড়ল,–হুঁ। একদম বাতাস নেই।

–তুমি চান করবে না?

–করব। একটু ঠাণ্ডা হয়ে নিই।

–শরবত খাবে? লেবু চিনি দিয়ে?

–নাহ্। এক কাপ চা পেলে ভাল হত। ঝুঁকে রান্নাঘরের দিকে দেখল শ্যামলী, –রেবা আছে?

–মানে তোমার রান্নার লোক? এই তো একটু আগে গেল। আমি করে দেব চা?

–তুমি পারবে?

ঝুমুর হেসে ফেলল, –অত অলবড্ডি নই মা। বাড়িতে চা করি।

–করো তবে। শ্যামলী তবু সামান্য দ্বিধাগ্রস্ত, –সাবধানে গ্যাস জ্বেলো। আমার ডানদিকের বার্নারটা গণ্ডগোল করে।

–তোমার তো লিকার চা? অল্প চিনি?

মেয়ের মনে আছে! শ্যামলীর ভালই লাগল একটু।

ঝুমুর সরে যেতে শ্যামলী উঠে নিজের ঘরে এল। এ ঘরে একখানা খাট পাতা আছে বটে, তবে রাতে সে সাধারণত সুপ্রভার ঘরে গিয়েই শোয়। রাতভর মাকে একা ফেলে রাখতে তার ভরসা হয় না। রাতে বার বার ওঠেন সুপ্রভা, একবার পড়ে টড়ে গেলেই চিত্তির। বড় আলমারিটা খুলে ভেতরে ঘড়ি ব্যাগ রাখল শ্যামলী, ফের আলমারি লক করে চাবি গুঁজে রাখল তোষকের নীচে। বাড়িতে এখন বাইরের লোক নেই, তবু চাবি রাখার সময়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে নিল। এও অভ্যাস। কাউকে বিশ্বাস না করাটা তো মজ্জায় মিশে গেছে।

পায়ে পায়ে শ্যামলী এবার পাশের ঘরে। সুপ্রভা বিছানায়, বাজুতে হেলান, হাতে রুদ্রাক্ষের মালা, চক্ষু অর্ধ নিমীলিত।

শ্যামলী গলা খাঁকারি দিল।

চোখ পুরো খুলে গেছে সুপ্রভার। জপের মালা ছুঁয়ে থাকা আঙুল স্থির। মুখে কান এঁটো করা হাসি।

নাতনির আগমনে ভারী পুলক জেগেছে দিদিমার!

শ্যামলী কেজো গলায় জিজ্ঞেস করল, –ওষুধ খেয়েছ ঠিক ঠিক?

জপের মাঝে কথা বলতে নেই। সুপ্রভা ঢক করে ঘাড় নাড়লেন।

–ব্যথা কেমন?

ওপর নীচে মাথা নড়ল। মানে, আছে।

–রেবা হটওয়াটার ব্যাগ দিয়ে গেছে?

এবার দু পাশে ঘাড় নড়ছে। অর্থাৎ না

–কেন দেয় নি?

এবার হাত চোখ মুখ সব এক সঙ্গে চঞ্চল। মার এই সব সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ শ্যামলী ভালই বোঝে। বড্ড গরম বলে গরম জলের ব্যাগ নেন নি সুপ্রভা। রেবার কোনও দোষ নেই, সে দিতে চেয়েছিল, তিনিই বারণ করেছেন।

মাকে নিয়ে চলা সত্যিই অসম্ভব। ডাক্তার টানা তিন মাস এখন সেঁক নিতে বলেছে, কমপক্ষে দিনে দুবার। ব্যথায় কাতর না হলে মা সব সময়ে এই চিকিৎসাটি ফাঁকি দিতে চায়! অন্য সময় হলে শ্যামলী ঝেঁঝেঁ উঠত, এখন ঠিক ততটা বিরক্তি এল না গলায়। হাত উল্টে বলল, বুঝবে ঠ্যালা। নাতনির সামনেই ব্যথায় কাতরাবে।

সুপ্রভার হিল্‌দোল নেই। হাসছেন।

কথা না বাড়িয়ে শ্যামলী নিঃসাড়ে রান্নাঘরের দরজায়। মেয়েকে দেখছে চুরি করে, ঝুমুর যেন হঠাৎই অনেকটা বড় হয়ে গেছে। এই এক বছরে। কী সুন্দর চুল হয়েছে মেয়েটার! সামান্য কোঁকড়া থোকা থোকা চুল কাঁধ ছাপিয়ে নেমে এসেছে পিঠের মাঝামাঝি। শরীরও দিব্যি ভরভরন্ত। সালোয়ার কামিজের ওড়না কাঁধে কেমন ঝুলিয়েছে দ্যাখো, যেন এক যুবতী কন্যে। গায়ের রঙ অসম্ভব ফর্সা, দুধে-আলতায় মেশানো। একেবারে ঠাকুমার গাত্রবর্ণটি পেয়েছে ঝুমুর। চোখ নাক মুখ টানা টানা, বাপের মতো। ঠোঁটের কাছটাই যা একটু উঁচু উঁচু, এইটুকুই শুধু মার। গভীর মনোযোগে চা বানাচ্ছে ঝুমুর। পরিপাটি করে কাপে চিনি দিল। লিকার ঢালছে। অতি মৃদু স্বরে গান গাইছে গুনগুন।

কাপে চামচ নাড়তে নাড়তে হঠাৎই ঘাড় ঘোরাল ঝুমুর। বিস্মিত স্বরে বলল,–তুমি?

ধরা পড়ে যাওয়া মুখে হাসল শ্যামলী,–না.....একটু জল খাব।

–ও।.....ফ্রিজের জল খাবে? না এমনি জল?

–তোমায় ব্যস্ত হতে হবে না, আমি নিয়ে নিচ্ছি।

জল খেয়ে চা নিয়ে শ্যামলী সুপ্রভার ঘরে এল। সঙ্গে সঙ্গে ঝুমুরও। সুপ্রভার জপতপের পালা শেষ, রঙ্গরসিকতা চলছে নাতনির সঙ্গে।

–কী রে ঝুমি, তোর বহরমপুরের খবর টবর কিছু বল?

ঝুমুর আড়ষ্ট জবাব দিল,–বহরমপুরের আর কী খবর! বহরমপুর বহরমপুরের মতোই আছে।

–সে খবর কে জানতে চায়। আসল খবর বল্।

–আসল খবর আবার কী?

–বড় হয়েছিস, যৌবন এসে গেছে...কোন স্পেশাল ছেলে বন্ধু-টন্ধু হল?

ঝুমুর যেন আরও আড়ষ্ট হয়ে গেল। শ্যামলীকে আড়চোখে দেখে নিয়ে বলল, – আহ্ দিদা, তুমি যে কী বলো না!

–অ। মার সামনে বলতে বুঝি লজ্জা হচ্ছে?...এই খুকু, তুই যা তো এখান থেকে, আমরা দুটিতে খানিক মনের প্রাণের কথা বলি।

শ্যামলীও যেন সরে যেতে পারলে বাঁচে। মেয়ের আগমনবার্তা শুনে নিজেকে সে যথাসম্ভব উদাসীন রাখার চেষ্টা করেছিল, মেয়েকে দেখার পর নির্লিপ্তিটা টাল খেয়ে যাচ্ছে, তবু একটা অসহজ ভাব তো রয়েই যায়। শুঁয়োপোকার মতো নড়াচড়া করে বুকে।

স্নানে চলে গেল শ্যামলী। মোটামুটি তরতাজা হয়ে বেরিয়ে দেখল সুপ্রভা ঝুমুরের মনের প্রাণের কথা শেষ, সুপ্রভা নিজের ঘরে টিভি চালিয়ে সিরিয়াল দেখছেন, ঝুমুর ড্রয়িংস্পেসে একা বসে। ম্যাগাজিন উল্টোচ্ছে ঝুমুর।

শ্যামলী ব্যস্ত হল, –ওমা, তুমি এখানে কেন? টিভি দেখছ না?

ঝুমুর নাক সিঁটকোল, –আমার বাংলা সিরিয়াল ভাল লাগে না।

–অন্য কিছু তো দেখতে পারো। দিদাকে বলে চ্যানেল ঘুরিয়ে দাও।

–না না থাক, দিদা দেখছে।...আমাকে এবার পড়তে বসতে হবে।

–ও হ্যাঁ। তোমার পরীক্ষা তো পরশু, তাই না?

–হ্যাঁ।...বাবা বলল একদিন আগেই যাও, থিতু হয়ে পরীক্ষা দিতে পারবে।

–তোমার সিট্ ফোর্ট উইলিয়াম স্কুলে পড়েছে বলেছিলে না?

–হ্যাঁ। চেনো স্কুলটা?

–ওই তো হেস্টিংসে। যেতে আসতে দেখেছি।

–পরশু আমার সঙ্গে একটু যাবে?

শ্যামলী চুলে চিরুনি চালাচ্ছিল। হাত থেমে গেল। অস্ফুটে বলল, –তোমার বাবা?

–বাবা তো ফিরে গেল। পাঁচটা কত'য় যেন ট্রেন।

–ও। তো যাবে আমার সঙ্গে। অসুবিধে কী আছে! তোমার তো এক দিনই পরীক্ষা?

ঝুমুর ঘাড় নাড়ল, –হুঁ।

শ্যামলী একটু চুপ করে রইল। তারপর হঠাৎই প্রশ্নটা করে ফেলেছে, – তোমার বাবা কি আবার তোমায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার দিন আসবে?

–উঁহু। বাবা আর আসবে না। পিসি সামনের মঙ্গলবার বহরমপুর যাচ্ছে, আমি পিসির সঙ্গে চলে যাব।

শ্যামলীর মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, –তা তুমি এবার পিসির বাড়ি উঠলে না যে বড়?

ঝুমুর যেন থতমত খেয়ে গেল। হাঁ করে একটু দেখল শ্যামলীকে। তারপর পাল্টা প্রশ্ন করেছে,–আমি এসেছি বলে কি তোমার অসুবিধে হয়েছে?

শ্যামলী বুঝতে পারল ও কথা বলাটা ভুল হয়ে গেছে। ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় ঠিক ভাবে কথা বলতে পারে না বলেই তো অনেকে তাকে ভুল বোঝে। তাড়াতাড়ি ঢোঁক গিলে বলল,–আমার আর কিসের অসুবিধে! আমি তোমার কথা ভেবেই বলছিলাম।...এটাও তো তোমারই বাড়ি। তুমি যখন খুশি এসে থাকতে পারো ..কিন্তু তুমি তো এত ছোট্ট জায়গায় থেকে অভ্যস্ত নও। বহরমপুরে তোমাদের বাড়ি কত বড়, এমনকি তোমার কাকা পিসিদের বাড়িও কত ছড়ানো ছেটানো... তোমার এখানে অসুবিধে হতেই পারে।

ঝুমুরের দৃষ্টি পলকের জন্য শ্যামলীতে স্থির। কী যেন দেখছে। দেখছে? না বুঝতে চাইছে? ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠল,–ফ্ল্যাটটা ছোট কোথায়? দু–দুটো ঘর, বাথরুম, ব্যালকনি, খাওয়ার জায়গা, বসার জায়গা, সবই তো আছে।

–ধুস্, ঘর কোথায়! খুপরি তো। দশ বাই বারো! এগারো বাই বারো! ব্যালকনিটা এত সরু, দুটো টব পাশাপাশি রাখলে জুড়ে যায়।

–কত সাইজ ফ্ল্যাটটার?

–কে জানে কত! প্রোমোটার তো বলেছিল ছশো তিরিশ স্কোয়্যার ফিট,

আমার হিসেবে অত আসে না। এই ফ্ল্যাটের সাড়ে চার লাখ টাকা দাম হয়?

ঝুমুর আবার একটু দেখল শ্যামলীকে,–তুমি লোন করে কিনেছ, না মা ?

–নইলে অত টাকা একসঙ্গে পাব কোথ্‌থেকে? হিসেব করে দেখেছিলাম মাসে মাসে দু আড়াই হাজার টাকা ভাড়া গোনার চেয়ে কষ্টেশিষ্টে সাড়ে তিন হাজার টাকা করে কাটাতে পারলে মাথার ওপর নিজস্ব একটা ছাদ হয়ে যাবে। জায়গাটা তখন খুব পছন্দ হয়ে গেল। দিব্যি খোলামেলা, সামনেই বাইপাস কানেক্টার...

–বটেই তো। খুব ভাল করেছ। সব থেকে বড় কথা, সাহস করে কিনে ফেলেছ তো।

কথাটা ঠং করে লাগল কানে। বেসুরো বাজনার মতো নয়, সুমধুর ঘণ্টা ধ্বনির মতো। বেশ প্রাপ্তবয়স্কদের মতো কথা বলছে তো ঝুমুর!

কিন্তু তার ফ্ল্যাট কেনার সাহসটাকে কি মন থেকে প্রশংসা করল মেয়ে? নাকি ভবিষ্যতের জন্য তার আর একটা প্রপার্টি হয়েছে, এই ভেবেই উল্লসিত মনে মনে?

ছিঃ ছিঃ, এত সংশয়? শ্যামলী কড়া ধমক দিল নিজেকে। তোর মনটা সত্যিই বড় ছোট হয়ে গেছে রে শ্যামলী!

।। চার ।।

কখনও কখনও রাতে এ বাড়িতে থাকলে সুপ্রভার কাছেই শোয় ঝুমুর। শ্যামলী তখন আপন কক্ষের একক শয্যায়। ঝুমুরের সেই তেরো বছর বয়স থেকেই এরকম ব্যবস্থা চলে আসছে। সুপ্রভার পাশে শুতে ঝুমুর যতটা স্বচ্ছন্দ, শ্যামলীর পাশে ততটা নয়। অনেক রাত অবধি দিদা নাতনির কলকল খিলখিল চলে, শুনতে পায় শ্যামলী।

এবারই প্রথম অন্য রকম আয়োজন। রাত জেগে পড়বে বলে ঝুমুর শ্যামলীর ঘরটা চেয়ে নিল আজ। শ্যামলীর সিংগলবেড খাটে বইখাতা ছড়িয়ে বসেছে।

এ ঘরে আজ ঘুম আসছিল না শ্যামলীর। আশ্চর্য, এত ক্লান্তি ছিল শরীরে, তবু নিদ্রা কই! সুপ্রভাকে খাওয়ার আগে একটা ঘুমের ওষুধ দেওয়া হয়, তিনি এখন তামাটে তন্দ্রায়। শ্যামলী বিছানায় এপাশ ওপাশ করছিল। মেয়েটা ওঘরে একা একা পড়াশুনো করছে, পাশে গিয়ে বসবে কি? মায়েদের কি বসতে হয়?

কফি দুধ কিছু দিয়ে আসবে কি মেয়েকে? মায়েদের কি দিতে হয়? তখন বেশি খেল না মেয়েটা, মাত্র দুটো রুটি আর মুরগির ঝোল। বেশি রাতে খিদে পেতে পারে ঝুমুরের, ফ্রিজে সন্দেশ রাখা আছে। জিজ্ঞেস করে আসবে খাবে কিনা? মায়েরা কি জিজ্ঞেস করে?

একটু অস্থির হয়েই শ্যামলী বিছানা ছাড়ল এক সময়ে। পাশের ঘরে গিয়ে চক্ষুস্থির। ওমা, পড়বে কি, মেয়ে তো ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোছে! কেমন অদ্ভুত ভাবে শুয়ে আছে দ্যাখো! একটা পা ঝুলছে খাটের বাইরে, হাত কেতরে আছে, মাথায় বালিশ নেই! মায়েরা কী করে এখন? ঠিক ভাবে মেয়েকে শুইয়ে দেয়?

বিছানায় ছত্রাকার খাতাবইগুলো গুছিয়ে তুলল শ্যামলী, রাখল ড্রেসিংটেবিলে। ওড়নাখানা টেনে নিয়ে পাট করে রাখল আলনায়। মেয়েকে সন্তর্পণে ঠেলে শুইয়ে দিল বিছানার মধ্যিখানে, বালিশে মাথা তুলে দিল। উম্‌ম্‌ম্‌ করে উঠল ঝুমুর, কী একটা আঁকড়ে ধরতে চাইল! পাশবালিশ খুঁজছে নাকি? এনে দেবে ওঘর থেকে ছোট পাশবালিশটা?

নির্নিমেষে মেয়ের মুখপানে তাকিয়ে আছে শ্যামলী। নিষ্পাপ মুখে কী অপরূপ শোভা। মায়া জাগে বড়। মেয়েকে একটু আদর করতে ইচ্ছে করছে। হাত রাখতে ইচ্ছে করছে মেয়ের মাথায়। রাখবে? যদি মেয়ে জেগে ওঠে? যদি ভাবে এটা মায়ের আহ্লাদিপনা?

নিয়তির কী ঠাট্টা! এই মেয়ে তার একান্ত আপন হতে পারত। অথচ হল না। গর্ভে বহন করল শ্যামলী, প্রসববেদনা সহ্য করল শ্যামলী, অথচ মেয়ে হিমাংশুর হয়ে গেল। আইন আদালত তাই তো বলল।

কোনটা নিয়তির বড় ঠাট্টা? মেয়ের পর হয়ে যাওয়া? নাকি হিমাংশুর সঙ্গে শ্যামলীর বিয়ে হওয়াটা?

আলোটা নিবিয়ে শ্যামলী ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াল। আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ। মেঘের গায়ে লালচে আভা। আধখানা চাঁদ মেঘের আড়ালে হারিয়ে যাচ্ছে বার বার। হঠাৎ হঠাৎ জেগে উঠছে এক আধটা নক্ষত্র । বিষণ্ন স্মৃতির মতো।

হিমাংশুর সঙ্গে শ্যামলীর বিয়ের যোগাযোগটাই তো হয়েছিল বেশ অদ্ভুত ভাবে। বেলডাঙায় একটা ওষুধের দোকান ছিল শ্যামলীর বাবার। ছোট, কিন্তু মোটামুটি চালু ব্যবসা। দোকান চালিয়েই বেলডাঙাতে একটা বাড়ি তুলে

নিয়েছিলেন শিবপ্রসাদ। বেলডাঙার লাগোয়া খানপুর গ্রামে শ্যামলীদের আদি বাড়ি, সেখানে শিবপ্রসাদের কিছু জমিজিরেতও ছিল। কাজেকর্মে প্রায়শই বহরমপুর ছুটতে হত শিবপ্রসাদকে। কখনও বা ডিস্ট্রিবিউটারের ঘরে, কখনও বা ব্যাংক, কখনও আদালত। বহরমপুরেই তার সীতেশ হালদারের সঙ্গে আলাপ, কর্মসূত্রে। মুর্শিদাবাদ গ্রামীণ ব্যাঙ্কের কর্মচারী ছিলেন সীতেশ। মোটামুটি অবস্থা, টাউনে নিজস্ব বাড়ি আছে, কথাবার্তায় একটু চালবাজ টাইপ। চরিত্রেরও দোষ ছিল সীতেশের। উদ্দাম জুয়া খেলতেন। হিমাংশু সেই সীতেশ হালদারের বড় ছেলে।

হিমাংশু তখন সবে ল পাশ করে প্র্যাকটিস শুরু করেছে বহরমপুর কোর্টে। বিয়ের কথাবার্তাও চলছে। হিমাংশুকে দেখেই ভারি মনে ধরেছিল শিবপ্রসাদের। টগবগে জোয়ান, সুপুরুষ চেহারা, অমায়িক স্বভাব–এমন ছেলেকে জামাই করতে কার না সাধ যায়? কিন্তু কোন মুখে শ্যামলীর সঙ্গে বিয়ের কথা পাড়বেন শিবপ্রসাদ? তাঁর ওই একটি মাত্র মেয়ে বটে, কিন্তু মেয়েটা যে দেখতে মোটেই ভাল নয়। একেবারে বাপমুখো চেহারা। থ্যাবড়া নাক, উঁচু উঁচু দাঁত, পুরু ঠোঁট, গায়ের রঙটিও যথেষ্ট কালো। এক কথায় যাকে কুরূপা বলে, শ্যামলী তো তাই।

মনের বাসনা মনেই রেখে দিয়েছিলেন শিবপ্রসাদ। কিন্তু আকাশ থেকে একদিন একটা সুযোগ খসে পড়ল। ব্যাঙ্কে একটা আর্থিক কেলেংকারিতে জড়িয়ে পড়েছিলেন সীতেশ। তহবিল তছরুপের ব্যাপার। প্রায় লাখ দুয়েক টাকার হিসেব নেই। সীতেশের চাকরি প্রায় যায় যায়, শ্রীঘর বাস অনিবার্য। শিবপ্রসাদই তখন প্রায় বাঁচালেন সীতেশকে। ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের সঙ্গে শিবপ্রসাদের হৃদ্যতা ছিল, তিনি মাঝে দাঁড়িয়ে বললেন টাকাটা সীতেশ দিয়ে দেবেন, কিন্তু ঘটনাটা যেন চাপা পড়ে যায়। নিজেই টাকাটা জোগাড় করে সীতেশকে দিয়েছিলেন শিবপ্রসাদ। শর্ত ছিল একটাই, আমার মেয়েটাকে আপনার ঘরে নিতে হবে। মান-সম্মান বাঁচাতে সীতেশের ওই শর্ত মানা ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না তখন।

এক শুভ লগ্নে বিয়েটা হয়ে গেল। হ্যাঁ, শুভ লগ্নই। অন্তত শিবপ্রসাদ সীতেশের তখন সেরকমটাই মনে হয়েছিল। শ্যামলীর তখন উনিশ বছর বয়স, সবে হায়ার সেকেন্ডারি টপকে কলেজে ঢুকেছে। এমন লোভনীয় পাত্র তার

কপালে জুটেছে জেনে সেও তখন আনন্দে আত্মহারা।

ভুল ভাঙল ফুলশয্যার রাতেই। হিমাংশু তাকে স্পষ্ট ভাষায় বুঝিয়ে দিল শ্যামলীকে তার আদৌ পছন্দ হয় নি, নেহাত বাবার মুখরক্ষা করতে সে বিয়েতে বসতে বাধ্য হয়েছে।

প্রথম দু চারটে মাস তাও শ্যামলীর শরীরটা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেছিল হিমাংশু। অন্ধকার বিছানায় উঁচু দাঁত থ্যাবড়া নাকের সঙ্গে স্বর্গের অপ্সরীদের কীই বা তফাত! ক্রমশ সেই মোহটুকুও কেটে গেল।

সেই দিনগুলো এখনও যেন নোংরা পাঁকের মতো লেগে আছে গায়ে। উফ্, ভাবলেই এখনও গা ঘিনঘিন করে ওঠে শ্যামলীর। কী অপমান, কী অপমান! বন্ধুর বিয়েতে শ্যামলীকে সঙ্গে নিয়ে গেল না হিমাংশু। কী, না এমন বউ নিয়ে লোকসমাজে যেতে তার লজ্জা করে! ....রাতদুপুর অব্দি ফিরি না কেন? কেন ফিরব? আয়নায় নিজের মুখটা দেখেছ?...গাঁইয়া মেয়েছেলে, কী কথা বলব তোমার সঙ্গে?...বাপ কটা টাকা দিয়ে আমার মাথা কিনে নেয় নি, পাছায় লাথি মেরে তাড়িয়ে দেব.....

হ্যাঁ, এরকমই ভাষা ছিল হিমাংশুর। বাইরের জগতে যে রূপবান গুণবান অমায়িক,...ঘরে যে থাকে, সেই বোঝে ঘরের মানুষ কী চিজ!

তবে হ্যাঁ, শ্যামলীও বেশি দিন মুখ বুজে থাকে নি। রূপ না থাক, সে তো আর ভিখিরি বাড়ির মেয়ে নয়, কেন পড়ে পড়ে সহ্য করবে লাঞ্ছনা? সেও তাল দিয়ে কটুকাটিব্য করে গেছে হিমাংশুকে। চেঁচিয়ে পাড়া মাত করেছে। শ্বশুর শাশুড়ি তখন ভোল পাল্টে ফেলেছেন। অতীত ভুলে গেছেন। তাঁদের তখন কী উপদেশের বহর। কী করবে বউমা, রূপ না থাকলে গুণ দিয়ে পুরুষের মন জয় করতে হয়। তুমি সারাক্ষণ মুখের ওপর অত চোপা করলে তার মন তো বিষিয়ে যাবেই। দেবাংশু পর্যন্ত বলত, মেনে নাও বউদি, মানিয়ে নাও। দাদা এখানকার হিরো মানুষ, তাকে সব সময়ে ছোট কোরো না। রুমা আবার সান্ত্বনা দিত অন্য কায়দায়–একটা বাচ্চাকাচ্চা হয়ে যাক, দেখবে দাদা ঠিক ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। ভুটু হওয়ার আগে অব্দি আমার বরটাও তো কেমন উড়ু উড়ু ছিল, কিন্তু এখন কেমন সংসারী হয়ে গেছে বলো।

মেয়ে হওয়ার পরও কি শ্যামলীর ভাগ্যের চাকা ঘুরল? ছাই। উল্টে আরও খারাপ খারাপ টিপ্পনী–মেয়ের আমার কপাল ভাল, মা'র রূপ পায় নি!...মেয়েকে

তেল মাখিয়ে অমন রোদ্দুরে ফেলে রেখেছ কেন? তোমার মতো কেলেকুষ্টি বানাতে চাও?...বাচ্চা বিইয়ে এমন কিছু মাথা কিনে নাও নি, না পোষায় তো বলেই দিয়েছি মানে মানে কেটে পড়ো....।

আরও কত রকম ভাবে যে অসম্মান করেছে হিমাংশু তার কি কোনও লেখাজোকা আছে? বাড়িতে কুকুর বেড়াল পুষলেও মানুষের মায়া পড়ে, শ্যামলীর প্রতি হিমাংশুর কি সেইটুকু মায়াও ছিল? মনে হয় না.। শ্যামলীও অবশ্য কুকুর বেড়ালের মতো ক্রমাগত আঁচড়ে গেছে হিমাংশুকে। কেন আঁচড়াবে না? সে কি ঘাস? ইঁট? পাথর? প্রাণহীন চেতনাহীন একটা জড় বস্তু?

তবে জীবন ভারি বিচিত্র। প্রেমহীন, পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিহীন মানুষও দিব্যি দিনের পর দিন পাশাপাশি বাস করে যায়। ক্ষতবিক্ষত হয়েও বেঁচে থাকে। পাশপাশি ঘুমোয়, সাংসারিক কথাবার্তা বলে, মাঝে মাঝে গভীর রাতে জীবজন্তুর মতো মিলিতও হয়। আবার কখনও কখনও হঠাৎ এক বিধ্বংসী ঝড় এসে সম্পর্ককে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। কিম্বা হয়তো ঠিক তাও নয়। ধিকিধিকি তুষের আগুন যা রোজই জ্বলে, রোজই পোড়ায় পরস্পরকে, সেই আগুন থেকেই হঠাৎ একদিন একটা স্ফুলিঙ্গ ছিটকে গিয়ে সৃষ্টি করে দাবানল, পুড়ে ছারখার হয়ে যায় শুকনো সম্পর্কটা।

শ্যামলীর এখনও দিনটার কথা মনে আছে। ইংরিজি নববর্ষ। হিমাংশু পিকনিকে গিয়েছিল বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে। ফিরল প্রায় মাঝরাতে। যথেষ্ট মদ্যপান করেছে, পা রীতিমত টলছে।

ঘরে ঢুকেই তার কী উচ্ছ্বাস,–আহাহা, রঞ্জনা কী অপূর্ব গান গাইল! কী মিঠে গলা!

দেড় বছরের ঘুমন্ত ঝুমুরকে পাশে নিয়ে শ্যামলী তখন পুরো জেগে। প্রথমটা সে চুপচাপই শুনছিল, বার কয়েক স্তুতিবাক্য শোনার পর দপ করে জ্বলে উঠল, –তা ফেরার কি দরকার ছিল, তার গান শুনেই রাতটা কাটাতে পারতে।

হিমাংশু চোখ ছোট করে তাকাল,–কোথায় কী ভাবে রাত কাটাব, তুমি বলে দেবে?

–বটেই তো। তুমি বাইজিবাড়ি থাকবে, না বন্ধুর বউ-এর সঙ্গে গা ঘষাঘষি করবে সে তো তোমার ব্যাপার!

–কী? রঞ্জনাকে বাইজি বললে? যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা। রঞ্জনার সম্পর্কে আর একটা কথা বললে আমি তোমার জিভ ছিঁড়ে নেব। তুমি তার পায়ের নখের যোগ্য নয়।

শ্যামলীও মাথার ঠিক রাখতে পারল না। বলে বসল,–জোর আশনাই চলেছে বুঝি?

ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে গিয়েছিল হিমাংশু। পাগলের মতো দাপাদাপি করছিল। পাল্লা দিয়ে শ্যামলীও। রাতদুপুরে সে এক রৈরৈ কাণ্ড। নেশার ঝোঁকে শ্যামলীর গলা টিপে ধরতে এসেছিল হিমাংশু। নিজেকে ছাড়াতে গিয়ে হিমাংশুকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছিল শ্যামলী। তারপরই অঘটনটা ঘটল। খাটের কোণায় ধাক্কা খেয়ে মাথা ফেটে গেল হিমাংশুর। গলগল রক্ত বেরোচ্ছে।

ব্যস্, হিমাংশু তো ছিলই, শ্বশুর শাশুড়িও জো পেয়ে গেল। ঢাকের বাঁয়া হয়ে আসরে নেমে পড়ল শ্বশুর শাশুড়ি। চতুর্দিকে রটে গেল, হিমাংশুকে নাকি খুন করতে গিয়েছিল শ্যামলী। একটা অর্ধশিক্ষিত কুৎসিত গ্রাম্য মেয়েকে তারা ঘরের বউ করে এনেছিল, সেই কিনা শেষে এই আচরণ করল! জমি তৈরি হয়ে গেল, এরপর শ্যামলীকে গলাধাক্কা দেওয়া কি এমন ব্যাপার?

মেয়েটাকে পর্যন্ত নিয়ে আসতে দেয় নি নিষ্ঠুরের দল। শিবপ্রসাদ গিয়ে হাতে পায়ে ধরেছেন, তবুও না। শেষ পর্যন্ত শ্যামলীকে আদালতের শরণাপন্ন হতে হয়েছিল। তখনকার মতো মামলা জিতে মেয়েকে সে কাছে পেল বটে, রাখতে পারল না। হিমাংশু তখন এক অদ্ভুত প্যাঁচ খেলেছিল। কিছুতেই শ্যামলীকে ডিভোর্সের মামলা করতে দেয় নি তখন। বরং মাঝে মাঝে সে বেলডাঙায় আসত, মেয়ের সঙ্গে সময় কাটাত। শ্যামলীকেও আভাস ইঙ্গিতে বোঝাত সে একটা মিটমাটই চায়, নেহাত তার বাবা মা রাজি হচ্ছে না তাই....।

মেয়ের পাঁচ বছর পুরতে না পুরতে হিমাংশু স্বরূপে বিকশিত হল। নিজেই আদালতে মামলা আনল বিচ্ছেদের। কাঁড়ি কাঁড়ি সাক্ষী এনে প্রমাণ করে দিল, শ্যামলী নাকি মানসিক ভাবে পুরোপুরি সুস্থ নয়। তা ছাড়া মেয়েকে মানুষ করার মতো আর্থিক সামর্থ্যও তার নেই, কারণ সে তখনও কোনও চাকরি করে না। অতএব কন্যা প্রতিপালনের ভার হিমাংশুরই প্রাপ্য। আশ্চর্য, মেয়েও তখন বলেছিল সে মায়ের কাছে নয়, বাবার কাছেই থাকতে চায়।

কত বার আর আদালতে ছুটবে শ্যামলী?

তাও আবার সেই আদালতে, যেখানে সর্বত্র হিমাংশুর জাল বিছোনো!

মেয়েকে হারিয়ে শোকে দুঃখে পাগল হওয়াই স্বাভাবিক ছিল শ্যামলীর। কিন্তু কথায় বলে অল্প শোকে কাতর, অধিক সুখে পাথর...শ্যামলী পাগল হয় নি, পাথরই হয়েছিল । আবেগের টুটি টিপে ফিনিক্স পাখির মতো উঠে দাঁড়াতে চেয়েছিল শ্যামলী। বেলডাঙায় ফিরে এসেই শুরু করেছিল পড়াশুনা। ডিভোর্সের আগেই গ্র্যাজুয়েশান করে ফেলেছিল। মেয়েকে পাকাপাকি ভাবে হারানোর পরে শুরু হল তার চাকরির চেষ্টা। মরিয়া হয়ে। বাবা মা কারুর বাধা না মেনে। যারা তার সুখ কিনতে গিয়ে তাকে আগুনে পুড়িয়েছে, কেন সে তাদের ওপর ফের নির্ভরশীল হবে?

হিমাংশু অবশ্য আইন মেনে চলেছে বরাবরই। আইন মানে আদালতের রায়ের বয়ানটুকু। নিয়ম করে এক আধ মাস অন্তর অন্তর মেয়েকে পাঠিয়েছে বেলডাঙায়। শ্যামলী চাকরি করতে কলকাতায় চলে আসার পর বছরে এক আধ বার। মেয়েকে নিয়ে আসত দেবাংশু কিম্বা ঝুমার বাড়ি, সেখান থেকে একটা রাত্তির হয়তো শ্যামলীর জন্য বরাদ্দ। তার বেশি আর কিছুতেই মুঠোটি আলগা করবে না হিমাংশু। শত অনুরোধ উপরোধেও না।

ঝুমুরেরও কি তেমন টান ছিল কোনও দিন, শ্যামলীর প্রতি? দিদার কাছে ঝুমুর তাও অনেক সহজ, কিন্তু কী ভাবে যেন মার সঙ্গে তার একটা দূরত্ব তৈরি হয়েই গেছে। তুচ্ছ আলাপনের সময়েও মনে হয় আড়াল থেকে সুতো টানছে কোনও অদৃশ্য বাজিকর, পুতুলের মতো ঠোঁট নড়ছে ঝুমুরের।

এবার কি ঝুমুর একটু অন্য রকম?

চাঁদ এখন পুরোপুরি মেঘের আড়ালে। বাতাস হঠাৎই নিথর। একটা ঝড় বৃষ্টি হয়তো নামলেও নামতে পারে।

শ্যামলী বিড়বিড় করে বলল, –নামুক। নামুক। একটু অন্তত শীতল হোক পৃথিবীটা।

।। পাঁচ ।।

ইলেকট্রিক সাপ্লায়ের অফিসে থিকথিক করছে ভিড়। অজস্র কাউন্টার থেকে দীর্ঘ লাইন বেরিয়ে এঁকেবেঁকে পৌঁছে গেছে ফুটপাথে। বাইরে খর রোদ্দুর। চড়া তাপের সঙ্গে সঙ্গে মেজাজেরও পারা চড়ছে অনেকের। হট্টগোল বেধে যাচ্ছে মাঝে মাঝেই। কারণ ছাড়াই।

লাইনের মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে শ্যামলী গলগল ঘামছিল। ঘড়ি দেখছে ঘন ঘন। সাড়ে এগারোটা বাজে, বিল জমা দিয়ে বাড়ি ফিরতে আধ ঘণ্টা আরও লেগেই যাবে। আজ একবার ব্যাঙ্কে যেতে পারলেও ভাল হত, অনেক দিন পাসবইটা আপ-টু-ডেট করা হচ্ছে না। আজ আর সময় পাবে কি? ঝুমুর সকাল থেকে পড়াশুনোয় মগ্ন, ওর খাওয়া দাওয়ার আগে নিশ্চয়ই শ্যামলীর বাড়ি ফিরে যাওয়া উচিত। মেয়েটা থাকছে কদিন, নিজের হাতে একটু রান্নাবান্না করলে হত। চিংড়িমাছ কিনে নিয়ে যাবে গড়িয়াহাট থেকে? ছোট ছোট চিংড়ি দিয়ে রাতে ভাল করে ফ্রায়েড রাইসও বানানো যায়। যাক গে, কাল পরীক্ষা, বেশি কিছু উল্টোপাল্টা না খাওয়ানোই ভাল। বরং বিকেলে পুডিং করে দেবে আজ। ছোটবেলা থেকেই ঝুমুর পুডিং কাস্টার্ড খুব ভালবাসে।

একটা বাচ্চা ছেলে কেটলি হাতে ঘুরছে। চা। ভিড়ের মধ্যে বাণিজ্য। দুধ -চা খেলে শ্যামলীর অম্বল হয়, তবু ছেলেটাকে ডেকে ভাঁড়ে চা নিল। গরম পানীয়ে যদি গরমটা কাটে একটু।

ভাঁড়ে চুমুক দিয়েই আচমকা পেট গুলিয়ে হাসি উঠে এল শ্যামলীর। জিতেন সরকার নিশ্চয়ই অফিসে হত্যে দিয়ে পড়ে আছে এখন। নিশ্চয়ই মনে মনে শ্যামলীর মুন্ডুপাত করছে। উচিত জব্দ। দেখা যাক সাত দিনের মধ্যে কে তোর কারখানায় পা রাখে। শ্যামলী না বলে কয়ে ছুটি নিয়েছে, কাউকে চার্জ দিয়ে আসে নি, অন্য কোনও অফিসার সরকার এন্টারপ্রাইজ মাড়াতেই পারবে না।

পাশের কাউন্টারে টাকা জমা দিয়ে বেরিয়ে আসছে একটা ছেলে। বছর পঁয়ত্রিশ বয়স, একমুখ দাড়ি, ছোটখাটো হাইট, পরনে জিন্‌স পাঞ্জাবি। শ্যামলীকে দেখে হঠাৎই দাঁড়িয়ে পড়েছে ছেলেটা,–চিনতে পারছেন দিদি?

শ্যামলী চিনেছে ছেলেটাকে। তার ছোট ভাই বুলের সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল, ঝিল রোডে তাদের পাশের বাড়িতে থাকত, আনাগোনাও ছিল অল্প সল্প।

খুব একটা উচ্ছ্বাস দেখাল না শ্যামলী। হাসল সামান্য, –চিনব না কেন? তুমি তো তরুণ।...আছ কেমন?

–ওই একরকম। কেটে কুটে যাচ্ছে। রক্ত পড়ছে না।

–তুমি ইনসিওরেন্সে চাকরি করতে না?

–ওই আর কি। দিনগত পাপক্ষয়।

–অফিস যাও নি আজ?

–আমার তো কাছেই অফিস। গড়িয়াহাট মার্কেটের ওপরে। তরুণ চাপা গলায় বলল, –অফিসে সই করে কেটে এসেছি।

–এখনও ঝিল রোডেই আছ?

–নিজেদের বাড়ি ছেড়ে যাব কোথায়।..... আপনার ফ্ল্যাটটা নাকি খুব সুন্দর হয়েছে? তরুণ গাল ছড়িয়ে হাসল, –সব খবর পাই দিদি। মানুবৌদি একদিন আপনার ফ্ল্যাটে গিয়েছিল না! জানেনই তো, মানুবৌদি পাড়ার গেজেট।

মানু, অর্থাৎ ঝিল রোডে শ্যামলীর প্রাক্তন বাড়িঅলার পুত্রবধূ। একদিন গড়িয়াহাট মোড়ে দেখা হয়েছিল, ভদ্রমহিলা খুবই নাছোড়বান্দা, প্রায় জোর করেই এসেছিল শ্যামলীর ফ্ল্যাট দেখতে। গায়ে পড়া ভাব শ্যামলীর পছন্দ নয় জানা সত্ত্বেও।

শ্যামলী আলগা হাসি ফুটিয়ে বলল,–ওই করেছি একটা কোনও মতে।

–মাসিমা তো আপনার সঙ্গেই থাকেন?

–হুম ।

–বুল কি দিল্লিতেই আছে? সেই কী একটা পেইন্ট্ কোম্পানীতে চাকরি করছিল না?

–ও চাকরিটা এখন ছেড়ে দিয়েছে। এখন আছে নয়ডায়। একটা ফ্যান ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানীতে। ওই যে, যাদের ব্র্যান্ডের নাম সুপার কুল।

–বিয়ে থা করেছে?

–তোমায় মানুবৌদি বলে নি? পুট করে পিন ফুটিয়ে নিল শ্যামলী, –গত বছর একটা বাচ্চাও হয়ে গেছে।

–তাই? কী ছেলে, একবার জানাল না পর্যন্ত!

বুলের বিয়েটা সত্যিই বড্ড বেশি তাড়াহুড়ো করে হয়েছিল। যাদবপুরে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ত বুল, মেয়েটাও যাদবপুরেরই ছাত্রী। ওখানেই দেখাসাক্ষাৎ, প্রেম ভালবাসা। দিল্লিতে আগেই চলে গিয়েছিল বুল, শ্যামলী ফ্ল্যাট কিনে গুছিয়ে বসার পর পরই পুট করে দিল্লি থেকে এসে বিয়েটা সেরেই মেয়েটাকে নিয়ে চলে গেল। রেজিস্ট্রিই করেছিল, তবে সামাজিক অনুষ্ঠানও একটা হয়েছিল ছোট করে। খুব বেশি লোকজনকে ডাকা হয় নি। তরুণের সঙ্গে বুলের এমন কিছু সাংঘাতিক মাখামাখি ছিল না, স্রেফ সমবয়সি প্রতিবেশী বলেই বন্ধুত্ব।

খামোখা প্রাক্তন প্রতিবেশীকে কেন নেমন্তন্ন করবে বুল? মা না জোরাজুরি করলে বুল আত্মীয়স্বজনদেরই খবর দিত না, এরা তো কোন ছার।

শ্যামলী স্মিত মুখেই বলল, –মনে হয় যোগাযোগ করতে পারে নি।

–তাই হবে। আমিও তো ভেবেছিলাম বিয়েতে আপনাদের ডাকব....। তা বুল আসে কলকাতায়?

আগে বুল বছরে দু তিন বার আসত। বিয়ের পর যাতায়াতটা কমে গেছে। এখন বড় জোর একবার। শীতে। দিল্লিতে খুব ঠান্ডা পড়ে তো, পালিয়ে আসে। তবে বাচ্চা ছোট বলে গেল শীতে আর আসে নি। বুলের শ্বশুর শাশুড়ি ওই সময়ে তিন মাস কাটিয়ে এসেছে দিল্লিতে।

তা এত সব কথা তরুণকে কেন বলতে যাবে শ্যামলী। আলতো করে একটু মাথা নেড়ে দিল।

–এবার এলে একবার পাড়ায় আসতে বলবেন তো। বলবেন, আমরা ওকে খুব মিস করি।

–বলব।

–আমরা আপনাকেও খুব মিস করি। আমার মা আপনার কথা মাঝে মাঝেই বলে। কেমন সুন্দর মাকে নিয়ে ছোট ভাইকে নিয়ে থাকতেন। কী সেবাযত্ন করতেন মাসিমার। যখন মাসিমার বড় অপারেশনটা হল, বলতে গেলে আপনি তো তখন একা। বুল তো তখন কলকাতার চাকরি ছেড়ে দিল্লি ছুটল। বুল তো ওই সময়ে আসতেও পারে নি, তাই না?

–হুম্। তখন সবে নতুন চাকরি...

কথাটা বলতে বলতে শ্যামলী কিঞ্চিৎ অন্যমনস্ক। অপারেশান টেবিলে মা যদি মারা যেত, তাহলে কি আসত বুল? ছুটি পেত?

তরুণ ঘড়ি দেখছে। বলল, –আসি দিদি। পারলে একদিন যাব আপনার ফ্ল্যাটে। মাসিমার সঙ্গে দেখা করে আসব।

শ্যামলী মুখ ফিরিয়ে নিল। বুলের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে মনটা কেমন বিস্বাদ করে দিয়ে গেল তরুণ। ইদানীং কেমন যেন হয়ে গেছে বুল। শুধু নিজের সংসার, নিজের চাকরি, নিজের বউ, নিজের ছেলে–দুনিয়ায় আর কিছু নেই। শ্বশুর শাশুড়ি তিন মাস দিল্লি থেকে এল, বুল তাতে পরম আহ্লাদিত। সম্ভবত বউ খুশি হয়েছে বলে। অথচ নিজের মার এত সখ একবার স্বচক্ষে ছোটছেলের

ঘরসংসার দেখে আসার, তাতে কিন্তু বুলের কণামাত্র উৎসাহ নেই। উল্টে ভয় দেখায়, দিল্লি খুব বাজে জায়গা মা, গরমকালে চামড়া ঝলসে যায়। শীতকাল তো উরেব্বাস, আমরাই বলে পালাই পালাই করি। অত এক্সট্রিম ক্লাইমেট তোমার সহ্যই হবে না! কী যুক্তি! শীত গ্রীষ্ম ছাড়া দিল্লিতে যেন অন্য ঋতু নেই! মাকে তো সেই সময়েই একবারটি দিল্লি নিয়ে যেতে পারে। আসলে ঝুঁকি নেবে না, যদি খোঁড়া মা ঘাড়ে চেপে যায়। চোখের সামনে দেখেছে তো, দাদা কী খেলটাই খেলল। বড় ডাক্তার দেখানোর নাম করে মাকে কলকাতায় এনে তুলল দাদা, শ্যামলীর ঝিল রোডের বাসায়। মা এখন তোর এখানেই থাক খুকু, মানুষটাকে কাঁহাতক বেলডাঙা থেকে টানাহেঁচড়া করব। দেখছিস তো, বাবা চলে যাওয়ার পরই শরীরটা কেমন ভেঙে গেল মার। শ্যামলী তখনও প্যাঁচটা বোঝে নি, ছোটাছুটি করে মার পেটের অপারেশানটা করিয়ে দিল। খানিকটা সুস্থও হল মা, তার পরও নিয়ে যাওয়ার নামটি নেই। উল্টে ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদুনি গায়। মা তোর কাছেই তো বেশ ভাল আছে রে খুকু। বুলটা চলে গেল, তুই এখন একা, মা সঙ্গে থাকলে তুইও একটু বলভরসা পাবি। তাছাড়া তোর বউদিকে তো জানিস, মার সঙ্গে মোটে বনে না, দিনরাত ঠোকাঠুকি খটাখটি...আমি এখন দোকান সামলাব, না শাশুড়ি-বউ এর ঝগড়া থামাব....!

এক্কেবারে হক কথা। শ্যামলীর মতো সিন্দবাদ নাবিক থাকতে মার বোঝা দাদা টানবেই বা কেন? বাবার কপাল ভাল, তাকে এমন দশায় পড়তে হয় নি।

কী বলে এই সব সুপুত্রদের? বুদ্ধিমান? চতুর? ধূর্ত? হৃদয়হীন? না নেমকহারাম? শ্যামলী জানে না।

বিল জমা দিয়ে, গড়িয়াহাট বাজার থেকে সওদা সেরে শ্যামলী বাড়ি ফিরল প্রায় একটায়। এসেই অবাক। মেয়ে তখনও ডুবে আছে বইতে।

ঝুমুরের কান বাঁচিয়ে সুপ্রভাকে মৃদু ধমক দিল শ্যামলী, –কী গো, ঝুমুরের এখনও চান খাওয়া হয় নি?

–আমি তো কখন থেকে বলছি। গা করছে না। বলল মা আসুক, তারপর...

–আমার যদি ফিরতে দুটো তিনটে হত। ছি ছি, দু দিনের জন্য এসেছে... কী ভাবছে বলো তো!

–ভাবাভাবির কী আছে? ও তো ঘরেরই মেয়ে। আমিও তো খাই নি।

শ্যামলীর মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছিল, তুমি আর ও সমান? বলল না। মা

অবলীলায় ঘরের মেয়ে বলে দিলেও শ্যামলী কি তা ভাবতে পারে? সে এখন হিমাংশুর মেয়ের টেম্পরারি জিম্মাদার বৈ আর তো কিছু নয়।

শ্যামলী মেয়ের কাছে গেল। খাটে উপুড় হয়ে শুয়ে কী সব অঙ্ক কষছে ঝুমুর। পরনে স্কার্ট ব্লাউজ। কী বাচ্চা বাচ্চা দেখাচ্ছে ঝুমুরকে।

পাশে দাঁড়িয়ে শ্যামলী বললল, –এত বেলা করছ কেন? চান করে এসো।

–পরে করব। ছুটির দিনে আমি খেয়ে উঠে চান করি।

–এমন বিদ্‌ঘুটে অভ্যেস কেন?

–এমনিই। ভাল্লাগে, তাই। ঝুমুর উঠে বসে আড়মোড়া ভাঙল। শ্যামলীর রোদে-পোড়া চেহারাটা দেখল এক ঝলক, –তোমারও তো চান হয় নি।

–করব। চলো, তোমায় আগে খেতে দিয়ে দিই।

–তুমি এখন খাবে না?

–পরে খাব। চলো চলো, ওঠো।

–উঁহু, তুমি চান সেরে এসো। তিনজনে একসঙ্গে বসব আজ।

শ্যামলীর তবু একটু অস্বস্তি হচ্ছিল। বহরমপুরের বাড়িতে ছুটির দিনেও সাড়ে বারোটার মধ্যে আহারের পাট শেষ হয়ে যেত। অভ্যাসটা কি বদলে গেছে আজকাল? যাক গে, সে তার কর্তব্য করেছে, বলেছে মেয়েকে, বেশি পীড়াপীড়ি করার আর মানেই হয় না।

রেবাকে ভাত বাড়তে বলে চটপট গায়ে জল ঢেলে এল শ্যামলী। টেবিলে খাবার সাজিয়ে দিয়েছে রেবা, মা মেয়েকে নিয়ে শ্যামলী বসল খেতে। বুদ্ধি করে রেবা বেগুনি ভেজেছে কয়েকটা, মাছেরও পাতলা ঝোল না করে কালিয়া। ফেরার পথে শ্যামলী মিষ্টি দই এনেছিল, সেটাও নিয়ে নিল টেবিলে।

খেতে খেতে কথা হচ্ছিল টুকটাক। ঝুমুরের পড়াশুনা-সংক্রান্ত।

শ্যামলী জিজ্ঞেস করল, –তোমার কালকের পরীক্ষাটা ঠিক কী ঝুমুর?

–অঙ্ক পরীক্ষা। মানে....অঙ্কের অলিম্পিয়াড বলে একটা ব্যাপার আছে... এটা তারই প্রিলিমিনারি। যদি কালকের পরীক্ষাটা ভাল হয়, তাহলে আমি একটা রাউন্ড টপকাব। এরপর হয়তো আবার একটা এগ্‌জামে বসতে হবে। সে পরীক্ষাটা হবে সম্ভবত স্ট্যাটিস্‌টিকাল ইন্সটিটিউটে। সেটাও টপকাতে পারলে দিল্লি। সেখানেও যদি উতরোতে পারি তাহলে বুদাপেস্ট।... মানে হাংগেরির ক্যাপিটাল। এবার ওখানেই অলিম্পিয়াডের ফাইনাল রাউন্ড হওয়ার কথা।

সুপ্রভা বলে উঠলেন, –এ আবার কেমন ধারার পড়াশুনো? এখানে পরীক্ষা, সেখানে পরীক্ষা....?

ঝুমুর হেসে বলল, –একে বলে ম্যাথমেটিক্সের অলিম্পিক। খেলাধুলোর যেমন অলিম্পিক থাকে, এ অনেকটা সেরকম।

সুপ্রভা কিছুই বুঝলেন না। ঠোঁট উল্টোলেন।

শ্যামলীরও পরিষ্কার হচ্ছিল না ব্যাপারটা। তবু মেয়ে যাতে তাকে অজ্ঞ না ভাবে তাই জিজ্ঞেস করল–খুব কঠিন কঠিন অঙ্ক থাকে বুঝি?

–শুধু কঠিন? বলো ব্যাম্বু। কী যে থাকে, আর কী যে থাকে না। ক্যালকুলাস ম্যাথমেটিক্স জিওমেট্রি অ্যালজেব্রা...আমাদের কোর্সে যা পড়ানো হয় তার চেয়ে ঢের স্টিফ। এই তো একটা জিওমেট্রির প্রবলেম নিয়ে বসেছিলাম, কিছুতেই হচ্ছে না।

সুপ্রভা বললেন, –হয়ে যাবে। তোর ছোটবেলা থেকে অঙ্কে যা মাথা, তুই ঠিক পেরে যাবি।

–না গো দিদা, সত্যিই কঠিন। আমার তো এ পরীক্ষায় বসার ইচ্ছেই ছিল না। মিছিমিছি লোক হাসানো। আমি কালকেরটাতেই গাড্ডুস মারব।

–ওমা, সেকি। শ্যামলীর গলায় বিস্ময়, –প্রিপারেশান যদি না হয়ে থাকে তবে বসছ কেন?

–বাবা চাইছে যে। মাধ্যমিকে অঙ্কে নিরানব্বই পেয়েছিলাম, তার শাস্তি। ঝুমুরের মুখ যেন সামান্য করুণ দেখাল, – এই পরীক্ষার জন্য আলাদা করে কত পড়তে হয়। কত বাইরের বই ঘাঁটতে হয়। স্পেশাল কোচিংও দরকার। বহরমপুরে ওসব কে করবে?

শ্যামলীর ছোট্ট শ্বাস পড়ল। কলকাতায় তার কাছে থাকলে ঝুমুরের হয়তো সুবিধে হত। অফিসে তো গল্প শোনে, ছেলেমেয়ের লেখাপড়া নিয়ে বাবাদের চেয়েও নাকি মায়েদের বেশি মাথাব্যথা। শ্যামলী সে সুযোগই বা পেল কই!

সুপ্রভা তারিয়ে তারিয়ে আমের টক খাচ্ছেন। কিছু না বুঝেই মন্তব্য করে বসলেন –তোর ছোটমামা এখন থাকলে তোর চিন্তা ছিল না, তোকে এ ব্যাপারে ভাল বুদ্ধি দিতে পারত। ওরও অঙ্কে খুব মাথা ছিল তো।

বুলের প্রসঙ্গে ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই অফিসের কথা মনে পড়ে গেল শ্যামলীর। বলল– তোমার তরুণের কথা মনে আছে মা? বুলের বন্ধু...ঝিল রোডে আমাদের

পাশেই থাকত?

সুপ্রভা চোখ কুঁচকে ভাবলেন একটু, –কে বল্ তো? যে ছেলেটা ডিমভাজা খেতে ভালবাসত?

–হ্যাঁ, ওই ...আজ ওর সঙ্গে দেখা হল। আমাদের সবার খোঁজখবর নিচ্ছিল।

–বললি, বুলের ছেলে হয়েছে?

–সে তো বুলের বিয়ে হয়েছে তাইই জানত না।

–কী করা যাবে। তোরা এত নমো নমো করে বুলের বিয়েটা সারলি।

–আমরা? বুলই তো কিছু করতে দিল না!

–তবু তোরও তো উচিত ছিল পুরোনো পাড়ার লোকদের নেমন্তন্ন করা।

বাহ্ বাহ্, কী সুন্দর করে ত্রুটিটা শ্যামলীর ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছে মা!

শ্যামলী চাপা স্বরে বলল, –হুম্, সব দায় তো আমার।

–তুই দায় নিস্ বলেই বলছি। তারা তো হাত ধুয়ে ফেলে। সুপ্রভা যেন সামান্য মনমরা... –কোনও মাসে ভুল করে কটা টাকা পাঠিয়ে দেয়, ব্যস্ তাদের কর্তব্য শেষ।

ঝুমুরের সামনে ঝুমুরের মামাদের প্রসঙ্গ ভাল লাগাছিল না শ্যামলীর। থামাল, মাকে,–ছাড়ো ওসব কথা। ওদের তো সংসার টংসার আছে, আমার তো..

কথাটা শেষ করল না শ্যামলী । ঝুমুর খাওয়া থামিয়ে কেমন যেন চোখে তাকিয়ে আছে শ্যামলীর দিকে। বলতে চাইছে কি কিছু? বুকের মধ্যে অহরহ গুমরে চলা যন্ত্রণার ছাপ কি ফুটে উঠেছে শ্যামলীর মুখে? ঝুমুরের কি সেটা বোঝার মতো বুদ্ধি হয়েছে এখন? ধুস্, সতেরো বছরের মেয়ে অত কী বুঝবে?

শ্যামলী জোর করে সহজ হল । মেয়েকে বলল, –তুমি হাত গুটিয়ে বসে কেন? খাও। ...দেব আর একটা মাছ?

।। ছয় ।।

রেস্তোরাঁটি ভারি অভিজাত। ভেতরে নরম আলো, গান বাজছে মৃদু সুরে। পুরোন হিন্দি ছবির গান, মনটাকে মেদুর করে দেয়। চড়া এয়ারকন্ডিশনিং মেশিন হিম ছড়াচ্ছে, বাইরের চড়া তাপ টের পাওয়ার কোনও উপায়ই নেই।

শ্যামলী ব্যাগ খুলে কাগজের ন্যাপকিন বাড়িয়ে দিল মেয়েকে, –মুখটা

মুছে নাও।

ঝুমুরের মুখমণ্ডল এখনও মলিন। যেমনটি ভেবেছিল পরীক্ষা তেমনটিই হয়েছে। অর্থাৎ সুবিধের নয়। তিন ঘণ্টা অঙ্কের সঙ্গে কুস্তি লড়ে সে এখন বেশ বিধ্বস্ত। হল থেকে বেরিয়ে তো রীতিমত চোখ ছলছল করছিল ঝুমুরের। শ্যামলী আজ তাকে নিয়ে বাইরে কোথাও খাওয়ার পরিকল্পনা মনে মনে ছকে রেখেছিল, আগে ঝুমুরকে বলে নি, এখানে এসে খানিকটা হকচকিয়েও গেছে ঝুমুর। শ্যামলীও যে স্বচ্ছন্দ বোধ করছিল তা নয়, এমন জমকালো রেস্তোরাঁয় সেও তো সচরাচর আসে না। কর্মসূত্রে বহু বড় বড় কোম্পানীতে তার যাতায়াত, কচিৎ কখনও তারা লাঞ্চ-টাঞ্চে নিয়ে আসে এমন জায়গাতে, তবে তাতে কি আড়ষ্টতা কাটে!

সহজ হওয়ার জন্যেই শ্যামলী কথা বলছিল টুকটাক। আলগা ভাবে। মেয়েকে বলল, –পরীক্ষা নিয়ে আর অত ভাবছ কেন? যা হওয়ার তা তো চুকে বুকেই গেছে । এ তো এমন কিছু নয় যে তোমার কেরিয়ারে ক্ষতি হয়ে যাবে।

ঝুমুর সামান্য ক্লান্ত হয়ে বলল, –তা ঠিক, তবে....

–নিজেকে তো একটু যাচাই করে নিলে, এটুকুনিই লাভ।

ঝুমুর সান্ত্বনা পেল কি? তবে হাসল একটু। ন্যাপকিনটা ঘসছে গালে। জোরে জোরে শ্বাস নিল, –আহ্, গন্ধটা তো ভারি সুন্দর।

–তোমার ভাল লাগছে?

–হুঁউ।

–জুঁইফুলের স্মেল। আমি অবশ্য ল্যাভেন্ডারটাই কিনি। এবার পেলাম না।

–জুঁই-এর গন্ধও তো ভাল। বেশ মিষ্টি।

–তুমি নেবে এই ন্যাপকিন?

–আমি?

–হ্যাঁ-অ্যা। ঘাম টাম মুছবে। খুব ফ্রেশ লাগবে, বিশেষ করে গরমকালটায়। শ্যামলী পুরো প্যাকেটটাই বার করে মেয়েকে দিল,–এখনই ব্যাগে রেখে দাও।

টেবিলে টেবিলে সুবেশা নারী পুরুষ। আহারের ফাঁকে ফাঁকে আলাপচারিতার মৃদু গুঞ্জন। দেওয়ালে বেশ কয়েকখানা পেন্টিং মর্যাদা বাড়িয়েছে ভোজন গৃহের। মেঝের পুরু কার্পেটে ছোটাছুটি করছে দুটো বাচ্চা, তাদের কলকল আওয়াজে

পরিবেশ যেন আরও প্রাণবন্ত।

স্যুট টাই পরা এক যুবক অর্ডার নিতে এসেছে। হাতে কাগজ পেনসিল। শ্যামলী মেয়েকে জিজ্ঞেস করল,–কী খাবে? চাইনিজ? মোগলাই? কন্টিনেন্টালও খেতে পারো।

ঝুমুর লাজুক মুখে বলল,–যা হয় একটা কিছু বলে দাও না।

–উঁহু, আজ তুমি বলবে।

ঝুমুর যেন আরও লজ্জা পেল। মাথা দুলিয়ে বলল,–চাইনিজই বলো তবে।

এই রেস্তোরাঁয় কেতা আছে অনেক। আলাদা আলাদা ঘরানার রান্নার জন্য আলাদা অলাদা মেনুকার্ড। শ্যামলী চৈনিক খাদ্যের তালিকা বাড়িয়ে দিল মেয়েকে। বলল, –আগে একটা স্যুপ নিতে পারো।

–হুঁ। চিকেন-কর্ন স্যুপ নিই?

–যা খুশি নাও। সব আজ তোমার পছন্দ মতো।

ঝুমুরই থেমে থেমে অর্ডার দিচ্ছে। সময় নিয়ে। সুপের সঙ্গে জিঞ্জার রাইস, স্যুইট অ্যান্ড সাওয়ার চিকেন আর প্রন-বল। সব একটা করে প্লেট। পরিমাণ ভালই থাকে, দুজনের জন্য এক প্লেট করেই যথেষ্ট।

অর্ডার নিয়ে যুবকটি চলে যাওয়ার পর শ্যামলী জিজ্ঞেস করল, –তোমাদের বহরমপুরে এমন ভাল চাইনিজের দোকান আছে?

–আজকাল তো সব জায়গাতেই চাইনিজ বানায়। তবে খুব একটা ভাল নয়। একগাদা সস্ ফস্ ঢেলে কী একটা কিম্ভুত কিমাকার করে ফেলে। নতুন একটা দুটো রেস্তোরাঁ অবশ্য মন্দ নয়।

–তুমি এখন চাইনিজই বেশি ভালবাস নাকি?

ঝুমুর ঢক করে ঘাড় নাড়ল,–আমি সবই খাই। চাঁপ বিরিয়ানিও ভালবাসি।

–তো তাই নিলেও পারতে।

–থাকগে, আজ চাইনিজই খাই।.....গত বার পিসি ট্যাংরায় নিয়ে গিয়ে চাইনিজ খাইয়েছিল, দারুণ লেগেছিল।

গত বছর কেদার বদরি থেকে ফিরে রুমার কাছে কি আরও কিছু দিন ছিল ঝুমুর? নাকি তার পরেও কোনও সময়ে এসেছিল পিসির বাড়ি, শ্যামলীকে জানায় নি? জিজ্ঞেস করবে মেয়েকে? থাক গে, এলেও বা শ্যামলীর কী, না এলেই বা কী? শ্যামলী তো চিরকালই পর, ঝুমুরেরর পিসি টিসিরাই তো

বেশি আপন।

ঝুমুর কেমন চোরা চোখে দেখছে মাকে। একদৃষ্টে। ঠোঁট টিপে টিপে হাসছে।

শ্যামলী অস্বস্তি বোধ করছিল। জিজ্ঞেস করল,–কী হল, হাসছ যে?

–কিছু না। এমনিই।

–উঁহু, কিছু একটা ভাবছ। এমনি এমনি কেউ হাসে নাকি?

ঝুমুরের টেরচা চোখে রহস্যের ঝিলিক, –তুমি ভাল বিরিয়ানি করতে পার, তাই না মা?

–আমি? শ্যামলী যেন আকাশ থেকে পড়ল, –কে বলল?

–আমি জানি। টেবিলে রাখা চামচ কাঁটা নাড়াচাড়া করছে ঝুমুর। মাথা নামাল একবার। পলকে চোখ তুলেছে, –আমি তোমার পুরোনো ডায়েরি পড়েছি।

–ডায়েরি? আমার? কোথায়?

–বহরমপুরে। চিলেকোঠার ঘরে ছিল। ওখানে তো সব গল্পের বই-এর ডাঁই, ওখানেই পুরোন বইগুলো ঘাঁটতে ঘাঁটতে হঠাৎ ....। কত রকম রান্নার পদ যে লেখা আছে ডায়েরিটায়। বিরিয়ানি দো-পেঁয়াজা শাম্মি কাবাব....

শ্যামলীর মনে পড়ে গেল একসময়ে তাকে খেপামিতে পেয়েছিল বটে বহরমপুরে। পুরুষমানুষের হৃদয়ের দরজা নাকি পাকস্থলিতে, সুখাদ্য রেঁধে খাইয়ে তাদের নাকি গলিয়ে দেওয়া যায়, এমন একটা বিচিত্র ধারণা জন্মেছিল কোনও এক কালে। এবং ওই উদ্দেশ্যেই হরেক রকম রান্নার রেসিপি জোগাড় করত শ্যামলী। কখনও রেডিও শুনে, কখনও রান্নার বই পড়ে, কখন বা এর ওর তার মুখ থেকে। হিমাংশুকে তুষ্ট করার জন্য বানাত এটা সেটা। বাঁড়ি সুদ্ধু সকলেই খেয়ে প্রশংসা করেছে, শুধু হিমাংশুই কোনও দিন...। ছ্যা ছ্যা, কী নির্বোধই না ছিল শ্যামলী ।

ঝুমুর ফের বলল, –এখনও বানাও ওসব?

–তুৎ, সময় কোথায়? শ্যামলী প্রশ্নটা এড়াতে চাইল। আলগা স্বরে বলল, –ওসব খাবেই বা কে? প্রাণী তো আমরা দুজন, তার মধ্যে তোর দিদার ওই তো শরীরের হাল। আমারও তেলমশলা বেশি সহ্য হয় না।

–কেন? সহ্য হয় না কেন?

–আহা, বয়স হচ্ছে না।

–যাহ্, কী এমন বয়স? তোমার তো এখনও চল্লিশও হয় নি।

–তাও তো কম নয়।

শ্যামলীর বলতে ইচ্ছে করল, অনেক আধিব্যাধিও এর মধ্যে ভর করেছে রে শরীরে। সিঁড়ি ভাঙতে কষ্ট হয়, অল্পে হাঁপ ধরে, হঠাৎ দপদপ করে মাথার পিছনটা, গলা খাঁকারি দিতে শুরু করেছে হাঁটু কোমরও। থাক গে, এসব কথা হিমাংশুর মেয়েকে বলে কী লাভ। হয়তো ভাববে ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদুনি গেয়ে সহানুভূতি কুড়োনর চেষ্টা করছে মা।

শ্যামলী কারুর করুণা চায় না। সহানুভূতি চায় না। ভালবাসাও নয়।

টেবিলে স্যুপ দিয়ে গেছে। দুটো পাত্রে ভাগ করে নিল শ্যামলী। নিজে সামান্যই নিল, বেশিটাই দিল ঝুমুরকে। ঈষৎ নিরস গলায় বলল, –খাও। শুরু করো।

ঝুমুর চামচে স্যুপ তুলে ফুঁ দিচ্ছে। হঠাৎই আবার দৃষ্টি তির্যক, মুখে টিপটিপ হাসি।

শ্যামলীর ভুরু জড়ো, –আবার হাসি কেন?

ঝুমুরের হাসি চওড়া হল, –আমি তোমার আর একটা জিনিসও খুঁজে পেয়েছি ।

–কী?

–চিলেকোঠার ঘরে তোমার একটা গানের খাতাও ছিল। অনেক গানের স্বরলিপি আছে ওখানে। নজরুলগীতি অতুলপ্রসাদী...

মুহূর্তের জন্য শ্যামলীর স্নায়ু বিবশ। অনেক কাল আগের এক কুৎসিত রাত ঝলসে উঠল চোখের সামনে। বন্ধুর বউ-এর গানে বিভোর মাতাল হিমাংশু গর্জন করে উঠল কানের কাছে। শ্যামলী গান গাইতে পারে কিনা কোনও দিন জানতেও চায় নি মানুষটা।

ঝুমুর ঝুঁকেছে মায়ের দিকে, –তুমি গান শিখতে বুঝি ?

শ্যামলী মেয়ের ওপর রূঢ় হতে পারল না। তবু যেন একটু তেতো শোনাল গলাটা, –শিখেছিলাম কোনও কালে। বিয়ের আগে।

–বেলডাঙায়?

–না, বেথুয়াডহরিতে। ওখানে একজন শেখাতেন। রোববার রোববার।

–বিয়ের পরে আর চর্চা করো নি?

–না।

'না' শব্দটা কি একটু বেশি জোরে বলে ফেলল শ্যামলী? বিরক্তি ফুটে বেরোল কি গলা দিয়ে? নাকি কোনও অভিমান? কেন শ্যামলী দার্শনিক নির্লিপ্তি আনতে পারছে না নিজের ভেতরে? এতকাল পর হঠাৎ মেয়ের সামনে এভাবে রূঢ়তা প্রকাশ করা কি অর্থহীন নয়?

রেস্তোরাঁর মনোরম পরিমণ্ডলে বসেও মনটা কেমন কষটে মেরে যাচ্ছিল শ্যামলীর। পাশাপাশি একটা বিস্ময়ের অনুভূতিও জাগছিল। মেয়ে তাকে নিয়ে আজ হঠাৎ ঘাঁটাঘাঁটি করছে কেন? শ্যামলীর ফেলে আসা খাতায় ডায়েরিতে কিসের এত কৌতূহল হিমাংশুর মেয়ের?

।। সাত ।।

নিউ মার্কেট থেকে বেরিয়ে এদিক ওদিক তাকাছিল শ্যামলী। ট্যাক্সি খুঁজছিল। সারাটা দিন আজ টো টো গেছে খুব। এখন আর বাস মিনিবাসে উঠতে ইচ্ছে করছে না। বেরিয়েছিল সেই সকাল দশটায়। প্রথমে সায়েন্স সিটি, সেখানে তিন চার ঘণ্টা চক্কর, তারপর এই নিউ মার্কেট। সন্ধে নেমে গেছে, অফিসভাঙা ভিড়ে মেয়েকে নিয়ে সেদ্ধ হওয়ার তার কণামাত্র বাসনা নেই।

মেয়েকে দু সেট সালোয়ার কামিজ কিনে দিল আজ। বেশ দামি দেখেই। ঝুমুর বারবার না না করছিল, তবু জোর করেই কিনল। মেয়ের কাছে নিজেকে দামি বলে প্রতিপন্ন করার আশায় নয়, পাছে ঝুমুরের বাড়ির লোকরা তার রুচিটাকে খেলো ভাবে এই আশংঙ্কায়। অল্পস্বল্প কিছু প্রসাধনীও কিনল ঝুমুরের জন্য। নেলপালিশ পারফিউম লিপস্টিক। বিদেশী। মেয়েকে হাতে করে কখনও তো সেভাবে দিতে পারে না কিছু, এই দেওয়াতে তাই এক ধরনের তৃপ্তিও আছে, হেরে গিয়েও হার না মানার সুখ।

শ্যামলী নয়, ঝুমুরই একটা ট্যাক্সি ধরেছে। ডাকছে, –মা মা, এদিকে...।

দৌড়ে গিয়ে শ্যামলী উঠল ট্যাক্সিতে। প্যাকেট ফ্যাকেট সমেত । ক্লান্ত শরীর ছেড়ে দিল সিটে। পাশে ঝুমুর এখনও দিব্যি সতেজ, খুশি খুশি মুখে দেখছে চারদিক।

শ্যামলীর মনটা একটু একটু খারাপ লাগছিল। আজকাল আর মনের কোনও দুর্বলতাকে সে প্রশ্রয় দিতে চায় না, তবুও। অদ্যই শেষ রজনী, কাল বহরমপুর ফিরে যাবে ঝুমুর। কী ঝড়ের বেগে যে কেটে গেল দিনগুলো। মেয়ের তার

কাছে আদৌ থাকার কথা নয়, যে কটা দিন রইল সেটাই উপরি পাওয়া, এই অমোঘ সত্য হৃদয়ে গেঁথে থাকা সত্ত্বেও বিষণ্ণতা চারিয়ে যাচ্ছে বুকে। নিশ্চয়ই সামনের বছর এপ্রিল মে মাসের আগে আর আসবে না ঝুমুর। শ্যামলীর সঙ্গে এ কটা দিন কেমন কাটল ঝুমুরের? শ্যামলী তার যথাসাধ্য করেছে, যতটা সম্ভব সময় দিয়েছে মেয়েকে, আপাত চোখে ঝুমুরও বেশ প্রফুল্ল, কিন্তু সত্যি সত্যিই খুশি হয়েছে কি? আগল পুরোপুরি ভেঙে শ্যামলী যে মেয়ের সঙ্গে মিশতে পারে না, কেমন যেন বাধো বাধো ঠেকে, তা কি ঝুমুর টের পায়? পেলেই বা কী করা যাবে, শ্যামলী তো এখন নতুন করে নিজেকে বদলাতে পারবে না। শ্যামলীর ভেতরে যে নিদারুণ কষ্ট জমাট বেঁধে পাথর হয়ে আছে, সেও কি আর এখন ভেঙে ভেঙে দেখানো যায়? কাউকেই দেখাতে পারে শ্যামলী?

ছোট ছোট ঘটনা মনে পড়ছিল শ্যামলীর। চাকরি পাওয়ার পর হঠাৎ তার মাথায় একটা পাগলামি চেপেছিল। বিয়ের। হিমাংশু তাকে কোনও দিন গ্রহণ করে নি, মেয়েও নিজের রইল না, তাহলে নতুন করে আবার জীবন শুরু করতে ক্ষতি কী! একটা সঙ্গ পাওয়ার জন্য তার মনটাও তো ছটফট করে, শরীরও তো একটা পুরুষ চায়। তাছাড়া বিয়ে করে যদি সত্যি সত্যি সে সুখী হতে পারে তাহলে হিমাংশুর নাকেও তো ঝামা ঘষে দেওয়া যায়, নয় কি?

ব্যস, ভাবা মাত্রই কাজ। ঝপ করে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন। পাত্রপাত্রীর কলামে। বাড়িতে কাউকে কিছু না জানিয়েই। জবাবী চিঠিও এসে গেল কয়েকটা। বেশির ভাগই ডিভোর্সি পাত্র অথবা বিপত্নীক। অনেকেই পাত্রী দেখার আগে পাত্রীর মালকড়ি কত আছে জানতে চায়। দু একটা চিঠি তো সহবাসের প্রস্তাবও বহন করে এনেছিল। একজনের তো আরও খারাপ আবদার। ষাট বছরের বুড়ো স্রেফ বিনা পয়সায় সেবিকা পাওয়ার জন্য বিয়েতে আগ্রহী। দুটি বিবাহবিচ্ছিন্ন দাবীহীন পুরুষ অবশ্য শ্যামলীর সঙ্গে দেখা করেছিল, তবে একবার মোলাকাতের পর তারা আর শ্যামলীমুখো হয় নি।

শ্যামলীর এই বিয়ের বাসনাটা বাড়িতেও বেশি দিন গোপন থাকে নি। তখন কলকাতায় এক বাড়িতে পেয়িং গেস্ট হয়ে থাকত শ্যামলী। দাদা দেখা করতে এসেছিল। শ্যামলীর রুমমেট হাসতে হাসতেই সংবাদটি তুলে দিয়েছিল দাদার কানে। মা তো শুনেই হাউমাউ। এই জন্য তুই জোর করে কলকাতা গেলি! তোর কি হায়া শরম বলে কিচ্ছু নেই। বাবার প্রতিক্রিয়া আবার আর

এক রকম। তিনি গুম মেরে গেলেন। ধারণা হল মেয়ে তাঁকে শিক্ষা দিতে চাইছে! যেন চোখে আঙুল দিয়ে বলতে চাইছে, তুমি যখন আমার জীবনটা নষ্টই করে দিয়েছ, আমি এখন যা খুশি তাই করব। ভাই আর দাদার অবশ্য ভিন্ন অভিমত। সাধ হয়েছে যখন কর্ বিয়ে, তবে বেশি বাছাবাছিতে যাস্ না। তোকে যদি কেউ পছন্দ করে চোখ কান বুজে তার গলায় ঝুলে পড়্! অর্থাৎ শ্যামলীর ইচ্ছে-অনিচ্ছে, কামনা-বাসনা, রুচি, বিচার, বোধ, সব কিছুই মূল্যহীন। যেহেতু সে এক স্বামীপরিত্যক্ত, অসুন্দর নারী, যেমন তেমন একটা বর পেলেই তার ভাগ্যের কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

তা শেষ পর্যন্ত ইচ্ছেটা কেঁচেই গেল। হয়তো শ্যামলী নিজের পছন্দ অপছন্দকে একেবারে জলাঞ্জলি দিতে পারল না বলেই। সে একটা চাকরি করছে, পায়ের নীচে মাটি আছে, নতুন করে আর একটা পুরুষের করুণার পাত্র নিজেকে সে কেন ভাববে! আশ্চর্য, যেই না সে হাল ছেড়ে দিল, ওমনি বাড়ির সকলেরও স্বস্তির নিশ্বাস। মা বাবা ভাবল তাদের সম্মান রক্ষা পেল এ যাত্রা। ভাই দাদা বুঝে গেল সারাটা জীবনের মতো একটা কলুর বলদ মিলে গেছে, এবার তার ঘাড়ে যেমন খুশি জোয়াল চাপিয়ে দেওয়া যায়। এখন কিন্তু তাদের মুখ থেকেই শুনতে হয়, দিব্যি আছিস, সংসার করার টেনশান নেই, ঝাড়া-হাত-পা....

অর্থাৎ অসুস্থ মাকে নিয়ে বছরের পর বছর ঘর করাটা সংসার করা নয়!। কোর্ট যখন কপালে দুর্ভাগ্য দেগে দিয়েছে তখন ঝুমুরও তার পিছুটান নয়! আর বুকের মধ্যে অহরহ জ্বলতে থাকা তুষের আগুন তো ধর্তব্যের মধ্যেই পড়ে না!

বুক ভরে বড় করে একটা শ্বাস টানল শ্যামলী। ছাড়ছে ধীরে ধীরে। মন খারাপ করে আর কী লাভ, সবার জীবন তো এক খাতে বয় না।

–মা.... মা....? ঝুমুর ঠেলছে মৃদু।

শ্যামলী সচকিত হল। মুখে শুকনো হাসি ফুটিয়ে বলল, –উঁ?

–দ্যাখো তো এটা পছন্দ হয় কিনা। ঝুমুরের হাতে টিপের পাতা, –এটা তোমার জন্যে।

–আমার জন্যে টিপ? শ্যামলী রীতিমত অবাক।

–হ্যাঁ। আমি কিনলাম।

–কিন্তু....আমি তো টিপ পরি না।

–কেন পরো না? তোমার এত সুন্দর জোড়া ভুরু, মাঝখানে একটা টিপ থাকলে কত সুন্দর দেখাবে।

কথাটা টং করে বাজল শ্যামলীর কানে। এ জীবনে ভুল করেও কেউ তাকে সুন্দর বলে নি। ঝুমুর ব্যঙ্গ করছে না তো? নাকি হিমাংশুর সুন্দরী মেয়ে একটু স্তুতি গেয়ে তাকে ধন্য করতে চাইছে?

শুকনো মুখে শ্যামলী বলল,–কোনটাকে সুন্দর লাগবে? টিপটাকে? নাকি ভুরুটা ?

–তোমার মুখটাকে। বলতে বলতে পাতা থেকে একটা টিপ খুলে ঝপ করে শ্যামলীর কপালে লাগিয়ে দিয়েছে ঝুমুর। ঘাড় কাত করে পর্যবেক্ষণ করল ক্ষণকাল। তারপর মুখে একগাল হাসি, –এই তো, কী দারুণ লাগছে! তোমার কপালটা বড় তো, টিপ দিতেই মুখটা কত ব্রাইট হয়ে গেল!

শ্যামলীর বলতে সাধ হল, এই টিপপরা মুখকেও তোর বাবা কোনও দিন উজ্জ্বল দেখেনি রে! বলল না। মেয়ের সঙ্গে এত অন্তরঙ্গভাবে কথা সে বলতেই পারবে না। তাছাড়া ঝুমুর তাকে নিয়ে রসিকতা করছে কিনা এ সংশয়ও যে মন থেকে যাচ্ছে না।

শ্যামলী মুখে আপত্তি জুড়ল, –টিপ পরার অভ্যেস আমার একেবারেই চলে গেছে।

–অভ্যেস তো আবার করেই নেওয়া যায়।

–না না, কপাল চড়চড় করবে।

–করুক। খুলবে না।

মেয়ের মিষ্টি ধমকে এবার যেন সামান্য থতমত খেল শ্যামলী। মেয়ের চাওয়াটা আন্তরিকই মনে হচ্ছে। হয়তো মনে হওয়াটা সঠিক নয়, তবু বিশ্বাস করতে সাধ হচ্ছে। ভাল লাগছে।

লাজুক মুখে শ্যামলী চোখ ফেরাল বাইরে। সামনে বিড়লা তারামন্ডল। অজান্তেই গলায় ঈষৎ উচ্ছলতা এসে গেল,–দেখেছ, এটা বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম।

–জানি।

–ভেতরে গেছ কখনও?

–উঁহু।

–আমিও যাই নি। তুমি আর এক দুদিন থাকলে একসঙ্গে দেখে

নেওয়া যেত।

–যেমন আজ আমার অনারে তোমার সায়েন্স সিটি দেখা হয়ে গেল?

–বটেই তো। একা একা তো হয়ে ওঠে না। কেউ একজন সঙ্গে থাকলে...। শ্যামলী মেয়ের দিকে ঘুরে বসল, – বেশ করেছে কিন্তু সায়েন্স সিটিটা তাই না? ডাইনোসরাস রোপওয়ে...

–আমার কিন্তু সব থেকে মজার লেগেছে টাইম মেশিনটা। কী রকম সাঁ সাঁ করে ছুটিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। এঁকেবেঁকে। গোঁত খেয়ে।

–ও তো ইলিউশান। ছবির কায়দা।

–হতে পারে, তবু...সত্যি সত্যি ওরকম মেশিন থাকলে কিন্তু দারুণ হত। কী স্পিডে অতীতে চলে যেতে পারতাম। প্রাচীন মিশর, কিম্বা গ্রিস..মাত্র কয়েক সেকেন্ডে ....কী রোমাঞ্চকর!

টাইম মেশিনের থেকেও অনেক দ্রুত পিছন পানে চলে যেতে পারে এমন যন্ত্রের সন্ধান জানে শ্যামলী। মানুষের মন। তবে ওই যন্ত্রে অতীত অভিযান সর্বদাই রোমাঞ্চকর হয় না। শ্যামলী এও জানে।

শ্যামলী স্মিত মুখেই বলল, –অল রাইট। এর পর তুমি এলে আবার নয় টাইম মেশিনে চড়া যাবে।

–দিদাকেও একবার চড়ালে হয়।

–তাহলে আর দেখতে হবে না। তক্ষুনি ফিনিশ। বেশ শব্দ করেই হেসে উঠল শ্যামলী। স্বভাববিরুদ্ধ ভাবে। হাসতে হাসতেই জিজ্ঞেস করল, –কাল তো তোমার সকালেই যাওয়া, তাই না?

–না তো। আমরা তো যাব বিকেলে। সওয়া পাঁচটার লালগোলায়।

–সেকি। পৌঁছতে তো অনেক রাত হয়ে যাবে।

–তা হবে। এগারোটা তো বাজবেই।

–অত রাত্তিরে তোমরা দুজন....।

–কাকাও যাচ্ছে আমাদের সঙ্গে।

–ও।

শ্যামলী থমকাল একটু। মেয়ে আগে তো কাকার কথাটা বলে নি!। হঠাৎ ঠিক হয়েছে? রবিবার দেবাংশুর বাড়িতে গিয়েছিল ঝুমুর, দুপুরটা ছিল, তখনই কি স্থির হয়েছে? তবু কিছু প্রশ্ন যেন ঘুরপাক খাচ্ছে মনে।

শ্যামলী উগরেই দিল, –হঠাৎ কাকা পিসি সব বহরমপুর চলল? এই গরমে?

–পিসির যাওয়ার তো কথাই ছিল। ....কাকাকে বাবা ফোন করে ডেকেছে। ঝুমুর একটু থেমে থেকে বলল, –দাদু তো কোনও উইল করে যায় নি, তাই বাড়িটার ভাগাভাগি নিয়ে সবার সঙ্গে আলোচনা করবে।

–ও। শ্যামলী আর কৌতূহল দেখাল না। হিমাংশুদের পারিবারিক ব্যাপার নিয়ে সে মোটেই আগ্রহী নয়। সত্যি বলতে কি, ওই পরিবারে তার তো তেমন শিকড়ও গজায়নি কখনও। বছর আড়াই আগে দাদার মুখে হিমাংশুর বাবার মৃত্যুসংবাদ পেয়েছিল, মনে সামান্যতমও রেখাপাত করে নি। প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে বলল, –তোমার সামনের বছরে হায়ার সেকেন্ডারির ডেট অ্যানাউন্স হয়ে গেছে?

–হ্যাঁ। এপ্রিলের চৌঠা।

–আর টেস্ট?

–ডিসেম্বরে। আমাদের স্কুলের আবার অনেক ফ্যাকড়া। তার আগে আবার প্রিটেস্ট্ আছে। সেপ্টেম্বরের গোড়ায়।

–তুমি জয়েন্টে বসবে?

–ইচ্ছে আছে।

–ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বে? কম্পিউটার নিয়ে?

–বাবার তো তাই ইচ্ছে। তবে.....আমি ডাক্তারি পড়তে চাই।

–তুমি ডাক্তার হতে চাও?

ঝুমুর মজা করার ভঙ্গিতে বলল, –নইলে বুড়ো বয়সে তোমাদের দেখাশুনো করবে কে?

অপলক চোখে শ্যামলী মেয়েকে দেখল ক্ষণিক। বুঝিবা কথাটা হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করল। তারপর উদাসীন সুরে বলল, –আমার দেখাশুনো করতে হবে না। আমি কাউকে জ্বালাব না, পুট করে মরে যাব।

–মৃত্যুর কথা কি অত সহজে বলা যায় মা? ঝুমুরের স্বর যেন সামান্য আহত শোনাল, –মানুষ যা চায় তাই কি ঘটে সব সময়ে?

শ্যামলীর মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল সে আমার থেকে বেশি আর কে জানে, কোনও রকমে সামলে নিল। ক্ষণপূর্বের লঘু মুহূর্তটা ফিরিয়ে আনার জন্য বলল, –কিন্তু তোমার ডাক্তারি পড়া হবে কি?

–কেন হবে না?

–এই যে বললে তোমার বাবা চাইছে তুমি ইঞ্জিনিয়ার হও, বাবাকে রাজি করাতে পারবে?

–ভাবছ কেন সব কিছু বাবার ইচ্ছে মতো হবে? আমার ইচ্ছে অনিচ্ছে নেই? আমি ডাক্তার হতে চাইলে ডাক্তারই হব। নইলে জেনারেল লাইনে পড়ব। ইঞ্জিনিয়ারিং কভি নেহি।

বেশ জিদ্দি হয়েছে তো ঝুমুর। হিমাংশুর আদর্শ টোটকা। এই গুণটা কি শ্যামলীর কাছ থেকেই পেয়েছে মেয়ে? তার জিন যদি মেয়ের মধ্যে দিয়ে ক্রিয়া করে হিমাংশুকে এইটুকুও জব্দ করতে পারে তো মন্দ কি!

তরল গলায় শ্যামলী বলল, –চটপট তাহলে ডাক্তার হয়ে যাও। নাতনি ডাক্তার হলে তোমার দিদা খুব খুশি হবে, শরীরের ওপর নিশ্চিন্তে আরও অত্যাচার করবে। কিছু বললেই আমায় শুনিয়ে দেবে, তোকে আমায় নিয়ে ভাবতে হবে না, আমার ঝুমুর আছে।

–দিদা তোমায় খুব জ্বালায়, তাই না মা?

–নাহ্। আমার সবই অভ্যেস হয়ে গেছে।

বাড়ি পৌঁছোন অবধি আরও খানিক এলোমেলো কথা বলল মা মেয়ে। হালকা মেজাজে। কখনও পড়াশুনো, কখনও নিউমার্কেট, কখনও বা দিদার অসুখ...

ফ্ল্যাটবাড়ির গেটে মেয়েকে ঢুকিয়ে দিয়ে একটু মোড়ের স্ন্যাকস্ বারে গেল শ্যামলী। শিককাবাব কিনল কয়েকটা। মেয়েটা সেদিন মোগলাই খানার কথা বলছিল, একটু কিছু অন্তত খাক।

ফ্ল্যাটে পা রাখতে না রাখতেই সুপ্রভার ডাক উড়ে এল, –খুকু...? অ্যাই খুকু?

শ্যামলী মার ঘরে গেল, –কী হল?

– তোর দু দুবার ফোন এসেছিল। অফিস থেকে।

–অফিস...?

–হুঁ। জয়ন্ত ঘোষ ফোন করেছিল। বলছিল খুব জরুরি দরকার। তুই এসেই যেন অবশ্যি অবশ্যি ফোন করিস।

শ্যামলী ধন্দমাখা মুখে বলল , –কোথায় ফোন করব এখন? সাড়ে সাতটা বাজে...

–বলেছে সাড়ে পাঁচটার মধ্যে ফিরলে ওর অফিসে। সাতটার পরে হলে ওর বাড়ি।

অ্যাসোসিয়েশানের চাঁদার জন্য ছটফট করছে নাকি? ভাবছে টাকা দেওয়ার ভয়ে ডুব মারল? নাকি অন্য কোনও গণ্ডগোল?

চিন্তিত মুখে জয়ন্তর বাড়ির নম্বর ঘোরাতেই ওপারে উত্তেজিত স্বর–আরে, করেছটা কী। তুমি তো অফিসে হৈহৈ ফেলে দিয়েছ।

শ্যামলীর ভুরুর ভাঁজ বাড়ল, – কেন, কী হয়েছে?

–জিতেনকে এভাবে ডিচ্ করাটা তোমার ঠিক হয় নি। কথা নেই, বার্তা নেই, প্রোগ্রাম দিয়ে গা ঢাকা দিয়ে বসে রইলে?

কথাটা ঝাং করে গায়ে লেগে গেল শ্যামলীর। গলাও চড়ে গেল সামান্য, –গা ঢাকা মানে? আমার অসুখ বিসুখ করতে পারে না?

–তুমি তো তার কোনও ইন্টিমেশান দাও নি!

–জয়েন করার পর দেব। ফেলে দেব মেডিকেল সার্টিফিকেট। জিতেন সরকার পয়সা খাইয়ে হেডঅফিস থেকে অর্ডার বার করে এনে আমার সামনে আঙুল নাচাবে, আর ওমনি আমি লেজ গুটিয়ে ছুটব, আমি কি জিতেন সরকারের কেনা বাঁদী?

ও প্রান্তে জয়ন্তর স্বর থেমে রইল একটুক্ষণ। তারপরই গলা অস্বাভাবিক রকমের ভারি,–শোন শ্যামলী, ব্যাপারটা কিন্তু অনেক দূর গড়িয়েছে। মিনিস্টারের পি-এ'র সঙ্গে জিতেনের খুব জান পহেচান, সে ডিরেক্টারকে সাত বার ফোন করেছে। বড়কর্তা হেভি খেপেছেন তোমার ওপর।

– তো?

–কেন ফালতু ঝামেলা পাকাচ্ছ?... শোন, তোমায় কনফিডেনশিয়ালি একটা খবর জানাই। কাল স্পেশাল মেসেঞ্জার দিয়ে তোমার বাড়িতে চিঠি পাঠানো হচ্ছে। টু ফিনিশ দি ইন্সপেকশান বাই টুমরো। না করলে তোমাকে শো-কজ খেতে হবে। অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ গ্রাউন্ডে উল্টোপাল্টা জায়গায় ট্রান্সফারও করে দিতে পারে।

শ্যামলী স্তম্ভিত হয়ে গেল। জিতেন সরকার হাত এতখানি লম্বা করেছে?

ক্রুদ্ধ গলায় শ্যামলী বলল, –তোমরা সব জেনেশুনে হাত গুটিয়ে বসে আছ? স্ট্রেঞ্জ! একটা বাইরের বিজনেসম্যানের কথায় সরকারি ডিপার্টমেন্ট চলবে?

তোমরা হেড অফিসে গিয়ে কিছু বলতে পারছ না?

–বলার উপায় তুমি রেখেছ? তুমি তো আমাদেরও বিশ্বাস করো না। তুমি যে বাংক করছ সেটা পর্যন্ত জানিয়েছ আমাদের? সব চেয়ে বড় কথা, জিতেন সরকার তোমায় কোনও কুপ্রস্তাব দেয় নি, তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে নি...সিম্প্‌লি তুমি তাকে পছন্দ করো না বলে হ্যারাস করে যাবে দিস ইজ নট জাস্টিফায়েড।

–ও। তোমরাও তার মানে জিতেনের দলে!

–বাচ্চাদের মতো কথা বোলো না। মন থেকে সন্দেহবাতিকগুলো সরাও। দুনিয়াসুদ্ধু সবাই তোমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছে এ ভাবনাটা মোটেই হেল্‌দি নয়। আমি তোমার ওয়েলউইশার হিসেবেই বলছি। ভালর জন্যই বলছি। আর ট্যান্ট্রাম কোরো না, কাল ফার্স্ট আওয়ারে গিয়ে মানে মানে কাজটা তুলে দাও। ফল্‌স মেডিকেল সার্টিফিকেটের ঝামেলায় নয় নাই গেলে।

–আমি কাল যাবই না। করবই না।

–শ্যামলী, ডোন্ট বি স্টাবর্ন।

–এ কী রে ভাই! অসুখ বিসুখ না হোক, ছুটি নেওয়ার তো আমার ব্যক্তিগত কারণও থাকতে পারে। আমার মেয়ে এখন আমার কাছে আছে, আমি ওকে নিয়ে খুবই ব্যস্ত। অফিসের ঝঞ্ঝাট এখন আমি মাথায় নেব না। কিছুতেই না।

–অ্যাজ ইউ উইশ। যা ভাল বোঝো করো। আমি তোমাকে যা জানানোর জানিয়ে দিলাম।

–ঠিক আছে। থ্যাঙ্ক ইউ ফর দা অ্যাডভাইস্‌।

টেলিফোন রেখে খানিকক্ষণ ঝুম দাঁড়িয়ে রইল শ্যামলী। এই হল তার কপাল। অপমান অপমান অপমান। জীবনের সর্বক্ষেত্রে অকারণে শুধু অপমান সহ্য করে যাওয়া। বেশি জেদাজেদি করলে কাদায় নাক ঘষে দেওয়া হবে তার। কাল গিয়ে কাজটা না করে দিলে উল্টোপাল্টা জায়গায় বদলি তার হতেই পারে। হয়তো সেই কোন উত্তরবঙ্গে ঠেলে দেবে।। তখন মাকে নিয়ে...।

ঝুমুর পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, –অফিসে কি কোনও প্রবলেম হয়েছে মা?

শ্যামলী অস্পষ্ট ভাবে মাথা নাড়ল।

ঝুমুর অস্ফুটে বলল, –কী নিয়ে প্রবলেম? কদিন ছুটি নিয়েছ বলে?

শ্যামলী উত্তর দিল না। ম্লান হাসল শুধু।

।। আট ।।

একটা পাহাড়ি পথ বেয়ে উঠছে শ্যামলী। বড় বন্ধুর পথ, এখানে ওখানে খসে-পড়া নুড়ি, বেজায় চড়াই। শ্যামলীর পা পিছলে যাচ্ছে বার বার, কোনওক্রমে আঁকড়ে ধরছে পাহাড়ের গা। একবার নীচের দিকে তাকাল। কী ভয়ংকর খাদ! ওই অতলে তলিয়ে গেলে শ্যামলীর চিহ্ন পর্যন্ত থাকবে না। আবার উঠে হাঁচোড় পাঁচোড় করে ওপরে ওঠার চেষ্টা করল শ্যামলী। একটা বাঁক পার হল। আর একটা। পাথরে ঘষা লেগে লেগে সারা শরীর রক্তাক্ত, তবু শ্যামলী থামছে না। উঠছে, পড়ছে, আবার উঠছে...। এটা কি মহাপ্রস্থানের পথ? কোথায় এর শেষ? চূড়ায়? কিন্তু চূড়া তো দেখাই যাচ্ছে না, কেমন ধোঁয়া ধোঁয়া হয়ে আছে পাহাড়ের ওপরটা।

সামনে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। বসল শ্যামলী। জিরোচ্ছে। হঠাৎই সামনে এক সাফারি সুট। জিতেন সরকার? উঁহু, মুখটা তো হিমাংশুর। অজিত সান্যালের গলায় ধমকে উঠল হিমাংশু, ইউ আর হিয়ার বাই অর্ডারড টু গেট আউট ফ্রম দিস ওয়ার্ল্ড। শ্যামলী করুণ গলায় মিনতি জুড়ল, আর একবার স্যার, আর একবারটি চান্স দিন। হিমাংশু হা হা হেসে উঠল, তোমার মতো আগ্‌লি মেয়েছেলের কোথ্‌থাও স্থান নেই। জুতো মুখে করে বেরিয়ে যাও এখান থেকে। খুব তেজ বেড়েছিল, না? শ্যামলী কাতর গলায় ডুকরে উঠল, প্লিজ হিমাংশু, প্লিজ প্লিজ.... আজ আর কালটা বাদ দাও। আমি পরশু ঠিক যাব। এক পা এক পা করে এগিয়ে এল হিমাংশু। এক্কেবারে কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। গলায় ভারী বুটসুদ্ধু পাটা চেপে ধরল। চিপছে চিপছে...

শ্যামলী ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। এ কী দুঃস্বপ্ন, এ কী দুঃস্বপ্ন? ওফ্, বুকেও কী অসহ্য চাপ, ফুসফুস দুটো যেন এক্ষুনি ফেটে যাবে। এত ঘামই বা হচ্ছে কেন? হৃৎপিন্ডে কী যেন একটা ফুটছে! স্ট্রোক-টোক হয়ে গেল নাকি?

কাঁপা কাঁপা হাতে বেডসুইচটা টিপল শ্যামলী। ফ্যাটফেটে আলোয় কেমন ঝাপসা ঝাপসা লাগছে সব কিছু। টলতে টলতে নামল বিছানা ছেড়ে। হাঁটছে সন্তর্পণে, পাশের ঘরে ঝুমুর বা সুপ্রভা যেন না জেগে যায়। মাতালের মতো ড্রেসিংটেবিলের সামনে এল। ড্রয়ার হাতড়াচ্ছে। ওষুধ... কোনও ওষুধ আছে কি? কী ওষুধই বা খাবে এখন? হাতে এক পাতা অ্যান্টাসিড পেয়ে গেল।

থরথর হাতে ছিঁড়ে মুখে পুরে দিয়েছে দুটো ট্যাবলেট। কমবে কি আদৌ? যদি না কমে...? সে কি মরে যাবে? সে কি মরে যাচ্ছে? সন্ধেবেলাই তো বলছিল, পুট করে মরে যাবে...। তাহলে মৃত্যুকে এত ভয় কিসের?

পা ঘষটে ঘষটে শ্যামলী বিছানায় ফিরে এল। পাশের টেবিল থেকে হাত বাড়িয়ে গ্লাসটা নিল। জল খেল কয়েক ঢোক। গ্লাস রেখে হাঁটু মুড়ে বসে আছে। শ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করছে হাঁ করে। জিভ শুকিয়ে গেছে পলকে, তালু পর্যন্ত শুকনো। ফের জল খেল একটু। কষ্ট যেন কমছে সামান্য। শুয়ে পড়বে আলো নিবিয়ে? নাহ্, আলো থাক। অন্ধকার বড় ভয়ংকর, বড্ড বেশি ভয় দেখায়।

বালিশে মাথা রাখতে গিয়ে চমকে গেল শ্যামলী। দরজায় ঝুমুর। বিস্ফারিত চোখে দেখছে তাকে। দু-এক পল থমকে থেকে দৌড়ে পাশে এল। উদ্বিগ্ন গলায় জিজ্ঞেস করল, –কী হয়েছে? কী হয়েছে তোমার?

আধবোজা চোখে শ্যামলী হাত নাড়ল, –কিছু না।

–বললেই হবে? শ্যামলীর কপালে গলায় হাত বোলাল ঝুমুর, –এ কী, এ তো ভীষণ ঘামছ!

–বুকে বড় চাপ। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।

–ব্যথা করছে বুকে?

–করছিল। কমেছে একটু। বোধহয় গ্যাস থেকে...

–ওষুধ খেয়েছ কিছু?

– খেলাম তো। অ্যান্টাসিড।

–ডাক্তার ডাকব?...খবর দেব পাশের ফ্ল্যাটে?

–না। ঠিক হয়ে যাবে। তুমি যাও, ঘুমোও।

অন্যমনস্ক মুখে দু এক পা গিয়েও ফিরে এল ঝুমুর। বসল বিছানায়। সন্দিগ্ধ চোখে নিরীক্ষণ করছে শ্যামলীকে। বিড়বিড় করে জিজ্ঞেস করল,– তোমার কি প্রেশার টেশার আছে?

–জানি না। চেক করাই নি কখনও।

–এমন আগে কোনও দিন হয়েছে?

–না।

ঝুমুর যেন বিশ্বাস করল না কথাটা। ভুরু দুটো কুঁচকেই আছে।

শ্যামলী কষ্ট করে হাসল, –বলছি তো কিছু হয় নি। ওই কাবাব টাবাব খেলাম তখন, তার থেকেই গ্যাস অম্বল হয়ে গেছে। বলছিলাম না সেদিন, পেটে আর তেলমশলা সয় না।

– তো ডাক্তার দেখাও না কেন?

শ্যামলী জবাব না দিয়ে বলল, –আবার একটু জলটা দাও তো, খাই।

ঝুমুর গ্লাস বাড়িয়ে দিল। চুমুক দিয়ে শ্যামলী লম্বা শ্বাস টানল,–এই তো। এখন অনেকটা ভাল লাগছে। যাও, আর ব্যস্ত হতে হবে না।

ঝুমুর চলে গেল পাশের ঘরে। শ্যামলী যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। ছি ছি, শরীরটা তো কালও খারাপ হতে পারত। ঝুমুর চলে যাওয়ার পর।

মাথার বালিশের ওপর পাশবালিশটা চাপাল শ্যামলী। বালিশ উঁচু করে শুলে শ্বাসকষ্ট কম হয়, শ্যামলী জানে। গুছিয়ে গাছিয়ে আধশোওয়া হয়েছে কি হয় নি, ঝুমুর ফিরে এসেছে এ ঘরে। হাতে নিজের বালিশ।

শ্যামলী বিস্মিত স্বরে বলল, –কী হল, শুলে না?

উত্তর না দিয়ে বালিশটা বিছানায় রাখল ঝুমুর। অর্থাৎ এখানেই শোবে এখন। শ্যামলীর পাশে।

শ্যামলীর বুকটা চিনচিন করে উঠল। ব্যথা, কিন্তু অন্য রকম। সুখ-মাখানো । মায়া-জড়ানো।

শ্যামলী পুট করে আলোটা নিবিয়ে দিল। পাশে শুয়ে পড়েছে মেয়ে, হাত রাখল মেয়ের গায়ে। নিজের গলা থেকেই অচেনা স্বর শুনতে পেল শ্যামলী,– দূর পাগলি, আমার কিচ্ছু হবে না রে।

।। নয় ।।

ছুটতে ছুটতে শেয়ালদা স্টেশনে ঢুকছিল শ্যামলী। পাঁচটা কুড়ি বেজে গেছে, প্ল্যাটফর্ম লোকে লোকারণ্য, এগোতে গিয়ে শ্যামলী ধাক্কা খাচ্ছিল বার বার। চলতে চলতেই ইলেকট্রনিক বোর্ডটা দেখে নিল। সর্বনাশ, ন' নম্বরে দিয়েছে লালগোলা। এখনও অনেকটা হাঁটতে হবে। হে ভগবান, পৌঁছুতে পৌঁছতে ট্রেন না ছেড়ে দেয়।

উদ্বেগের পাশাপাশি নোংরা কাদার ছিটে। শ্যামলীকে আজ শেষ পর্যন্ত যেতেই হল জিতেনের কারখানায়। কী করবে, টিঁকে থাকতে হলে কখনও কখনও ঘোর অনিচ্ছের সঙ্গে সমঝোতা করতেই হয়। জয়ন্ত কাল সংবাদটা ভুল

দেয় নি, সত্যিই সকালবেলা এক বিশেষ বার্তাবাহক বাড়িতে হাজির। লোকটা খোদ বড়কর্তার আদেশনামা ধরিয়ে দিয়ে গেল শ্যামলীকে। বাধ্য হয়ে পরিদর্শনটা সেরেই এল শ্যামলী। জিতেন সরকার অবশ্য বিনয়ের অবতার হয়ে ছিল, শ্যামলীকে খাতিরযত্নও করেছে খুব। কিন্তু তাতে কি অপমানটা মোছে?

আরও একটা পরাজয়। ছেঁড়া টুপিতে আরও একটা মলিন পালক।

শ্যামলী কব্জি উল্টে ঘড়ি দেখল। পাঁচটা পঁচিশ। এসে গেছে ন'নম্বর প্ল্যাটফর্ম। কিন্তু ঝুমুর কোথায়? বলেছিল প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষা করবে, ট্রেনে উঠে গেছে কি? প্রতিটি কামরায় থিকথিক করছে মানুষ, কোথায় ঝুমুরকে খুঁজবে শ্যামলী?

একটার পর একটা কামরা পার হচ্ছিল শ্যামলী। তৃষিত চোখ সার্চলাইটের মতো ঘুরছে জানলায় জানলায়। নেই। নেই। ঝুমুর ভিড়ে হারিয়ে গেছে। ইশ, আর একটু আগে এলে হত। জিতেন বার বার করে ওর গাড়িটা নিতে বলছিল, কেন যে শ্যামলী তেজ দেখিয়ে প্রত্যাখ্যান করল। তুচ্ছ মানসম্মানবোধ হৃদয়কে যেন আরও বেশি কষ্ট দেয়।

মাঝামাঝি একটা কামরার দরজায় এসে শ্যামলী চিত্রার্পিতের মতো স্থির। ঝুমুর।

দরজার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল ঝুমুর, শ্যামলীকে দেখে দৌড়ে নেমে এল, –এত দেরি করলে?

শ্যামলী মৃদু হাসল, –হয়ে গেল দেরি। সব কিছু তো আমার হাতে নেই। কাজ....ট্যাক্সি...জ্যাম...

–কাজ মিটেছে ঠিক মতো?

–হুঁ।....ওরা কোথায়? তোর পিসি কাকারা?

–ওই তো, সিটে।...কথা বলবে?

–থাক।...তোমার সব জিনিসপত্র ঠিক গুছিয়ে নিয়েছ তো?

–আবার তুমি তুমি কেন মা? বললাম না, তুমি বললে বড় দূরের মনে হয়।

–হ্যাঁ, তাই তো।

–কী কথা দিয়েছ মনে আছে?

–কী রে?

–ডাক্তার দেখাবে। অসুখটাকে নেগলেক্ট করবে না।

–তুৎ, আমার কিচ্ছু হয় নি।

–মা....

–আচ্ছা বাবা আচ্ছা। দেখাব ডাক্তার।

–আর টেনশান ফেনশানগুলো এবারে কমাও।

–কমাব। তুই এবার উঠে পড়্। সিগনাল হয়ে গেছে।

উঠে দরজায় দাঁড়াল ঝুমুর। দুজন যাত্রী ছুটতে ছুটতে এসে উঠল কামরাটায়, সামান্য সরে গিয়ে তাদের জায়গা করে দিল।

শ্যামলী বলল, – পৌঁছে ফোন করিস একটা। আজ রাত্রেই।

–করব।

–আবার কবে আসবি?

–আসব।

–এবার আর একটু সময় নিয়ে আসিস। শ্যামলী মেয়েকে ঝাপসা দেখছিল। নাক টানল। প্রাণপণে অচঞ্চল রাখতে চেয়েও দুলে গেল স্বর, – আবার সায়েন্স সিটি যাব....। টাইম মেশিন...

ঠিক তখনই এক অদ্ভুত কাণ্ড করল ঝুমুর। সবুজ সংকেত ভুলে গিয়ে ঝুপ করে নেমে পড়েছে ট্রেন থেকে। দু হাতে শ্যামলীকে আঁকড়ে ধরল। ডুকরে কেঁদে উঠেছে হঠাৎ।

শ্যামলী হতভম্ব। নির্বাক। নিস্পন্দ। মেয়ের চোখের জলে শ্যামলীর সমস্ত গ্লানি যেন ধুয়ে যাচ্ছিল। কান্নাও যে এমন সুখের বার্তা বয়ে আনে, এ কি আগে জানত শ্যামলী!

শুধু ওই কান্নাটুকুর জন্যই বুঝি হাজার বছর বেঁচে থাকতে পারে মানুষ!

সুচিত্রা ভট্টাচার্যের জন্ম ভাগলপুরে মামার বাড়িতে ১৯৫০ সনে।

পিত্রালয় বহরমপুর মুর্শিদাবাদে। স্কুল ও কলেজ জীবন কেটেছে, দক্ষিণ কলকাতায়। কলেজে পড়ার সময় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তারপর প্রবেশ করেন চাকরি জীবনে। অনেক ধরণের চাকরি করেছেন। এখন সরকারি অফিসার।

সত্তর দশকের শেষ দিকে লেখা শুরু করেন। মেয়েদের নিজস্ব জগতের গল্প তাদের যন্ত্রণা, সমস্যা, আর অস্তিত্বের কথাই লিখতে ভালোবাসেন।

পেয়েছেন একাধিক সাহিত্য পুরস্কার। বর্তমানে বাংলা কথা সাহিত্যের জনপ্রিয় লেখিকা।